সম্পাদকীয়

সমাজ পরিবর্তনের এক অভাবনীয় আদর্শের ছোঁয়া

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের ইতিহাসে হলি আর্টিজানে হামলা একটি মোড় ঘুরানো বিষয়। এতো বড় মাপের জঙ্গি হামলা এর আগে বাংলাদেশে কখনো হয়নি। ১লা জুলাই হলি আর্টিজানের ভয়ানক সেই জঙ্গি হামলার এক বছর পূর্ণ হলো। এ উপলক্ষে বহু মানুষ সেদিন নিহত ব্যক্তিদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, জঙ্গিদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছে, শান্তি সমাবেশ করেছে। বহু দল, সংস্থা, সংগঠন এ উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এসব করে কি জঙ্গিবাদ নির্মূল হচ্ছে বা হবে? জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপগুলো কি যথেষ্ট? জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গত এক বছরে বহু প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, র‍্যালি, মানববন্ধন করা হয়েছে অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গত এক বছরের বিভিন্ন জঙ্গি-বিরোধী অভিযানে অন্তত ৫০ জন সন্দেহভাজন জঙ্গি নিহত এবং ১০০'র বেশি আটক হয়েছে। অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু ফলাফল কী? বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত এক বছরে বিভিন্ন অভিযানে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের অনেকেই নিহত এবং আটক হবার কারণে তাদের নেটওয়ার্ক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে বলে নিরাপত্তা বাহিনী ধারণা করছে। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে তাদের আবারো সংগঠিত হবার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পিস এন্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অব.) মুনিরুজ্জামান মনে করেন গত এক বছরে নিরাপত্তা বাহিনী যেভাবে জঙ্গি বিরোধী তৎপরতা চালিয়েছে সেটিকে 'সাময়িক সফলতা' বলা যায়। সমাধানের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কোনো কৌশল চোখে পড়ছে না বলে মন্তব্য করেন এ নিরাপত্তা বিশ্লেষক। তিনি বলেন, "রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটা কৌশল নীতি থাকতে হবে জঙ্গিবাদ সমস্যা মোকাবেলার জন্য। সাময়িক সফলতা নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগা ঠিক হবে না।"

এখন সব মহল থেকেই বলা হচ্ছে, জঙ্গিবাদ নির্মূলে শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন একটি সঠিক আদর্শের। এখন প্রশ্ন হলো- কোথায় সেই আদর্শ আছে? সেই আদর্শটি আসলে কী?

অনেকে বলছেন, দেশপ্রেমের চেতনায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, অনেকে বলছেন ধর্মনিরোপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ শিক্ষা দিতে হবে, কেউ আবার বলছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, যারা জঙ্গিবাদে জড়াচ্ছে তারা ধর্ম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজটি করছে। তারা মনে করছে এই রাস্তায় জীবন দিলে শহীদ হওয়া যাবে, জান্নাতে যাওয়া যাবে। সুতরাং তাদেরকে ঐ রাস্তা থেকে ফেরাতে হলে তাদের সামনে ধর্মের সঠিক রূপটি তুলে ধরতে হবে, সত্যিকার জান্নাতের রাস্তা দেখাতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা, নিরাপত্তাবিশ্লেষক, বুদ্ধিজীবী এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এখন বলছেন যে, জঙ্গিবাদ নির্মূলে একটি সঠিক আদর্শ লাগবে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

সমাজ যখন অন্যায়, অবিচার, অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন কিছু মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করে জীবনটাকে অর্থবহ করতে চায়। বহু বিত্তশালী মানুষ এমনকি বহু রাজা-বাদশাও সারা জীবন আনন্দ-ফূর্তি, ভোগবিলাসের পর জীবনটা নিরর্থক মনে করে, জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়ায়, জীবনকে উৎসর্গ করার পথ খুঁজে বেড়ায়। যেহেতু মানুষের মধ্যে পরমাত্মার অংশ আত্মা আছে, আল্লাহর রূহ আছে তাই জীবনের কোনো এক সময়ে যদি আত্মাটা জাগ্রত হয়ে ওঠে তবে সেটা আল্লাহর সাথে মিলিত হতে চায় যেমন প্রকৃতির নিয়মে নদী সমুদ্রে মিলিত হতে চায়। সঠিক পথ পেলে এই মানুষগুলোই সমাজের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে আর বিপথগামী হলে সমাজ তাদের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানেও এই শ্রেণির মানুষ আছে, তাদের এই চেতনার সুযোগটাই নিচ্ছে জঙ্গিবাদের উদ্গাতারা। এখন সেই আদর্শটি লাগবে যার ছোঁয়ায় এই মানুষগুলো নিজের জীবনকে সমাজের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে পারবে আর বিনিময়ে সে জান্নাতেও যেতে পারবে। তাহলে আর তারা বিপথগামী হবে না এমনকি যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের মধ্যে থেকেও অনেকে এই আদর্শের সংস্পর্শে এসে ভ্রান্ত পথ, জঙ্গিবাদের পথ পরিহার করবে। সেই আদর্শটি খুঁজে বের করতে হবে সকলকে। সেই আদর্শের ছোঁয়া আপনি পেতে পারেন ছোট্ট এই সংকলনে।

সূচিপত্র

- *আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত যাঁরা- তাঁদের নিকট প্রত্যাশা* ২
- *মহানবী (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য কী?* ৬
- *তওহীদবিহীন কোনো আমলই আল্লাহ গ্রহণ করবেন না* ৮
- *আল্লাহর হুকুম মানার দু'টি যুক্তি* ১১
- *প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশে আমার কিছু কথা* ১২
- *ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল* ১৬
- *কেমন ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামান?* ... ২১
- *যারা হেযবুত তওহীদের সাথে কাজ করতে চান তাদের উদ্দেশে* ২৪
- *হলি আর্টিজানে হামলার এক বছর* ... ২৬
- *তবে কি জাতির ধ্বংসই অনিবার্য?*..... ২৮
- *এই যদি দাজ্জাল না হয় তবে দাজ্জাল কে?* ৩০

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টামণ্ডলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৮১৬৭১২১৫৮ **ওয়েব:** www.bajroshakti.com **ই-মেইল:** bajroshakti@gmail.com

প্রেক্ষিত: আমাদের কার্যক্রম

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত যাঁরা- তাঁদের নিকট প্রত্যাশা

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, এমাম, হেযবুত তওহীদ

আজকের সামাজিক ও জাতীয় পরিস্থিতি:

এই কথা সর্বজনবিদিত যে, বর্তমানে আমরা এমন একটি সময় পার করছি যখন মানুষ নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ সব ধরনের অপরাধ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এমনকি সন্তান বাবা-মাকে, বাবা-মা সন্তানকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করছে। দুই বছরের শিশু থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধাও ধর্ষিত হচ্ছে। মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস, ঘৃণা, সংঘাত-সংঘর্ষ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। প্রতিদিনের সংবাদপত্র যেন ভয়াবহ দুঃসময়ের দিনলিপি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংখ্যা, সদস্য, দক্ষতা, প্রযুক্তি বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এত প্রচেষ্টা ও দিন-রাত পরিশ্রমের পরও অপরাধ বেড়েই চলেছে। এর কারণ কী?

শুধু শক্তিপ্রয়োগ নয়, প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা:

আমাদেরকে একটা বিষয় উপলব্ধি করতে হবে যে, মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব প্রাণী নয়, তার একটি আত্মাও আছে। মানুষের যখন আত্মিক অধঃপতন ঘটে, যখন সামাজিক অবক্ষয় মানুষকে গ্রাস করে ফেলে তখন শুধু শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাদেরকে অপরাধপ্রবণতা থেকে নিবৃত্ত রাখা সম্ভব হয় না, শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা প্রদান অপরিহার্য। মানুষকে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝানো, তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলার মধ্য দিয়ে অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। ধর্মের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ নির্জন স্থানেও কোনো অপরাধ করতে গেলে তার হৃদয় তাকে বাধা দেয়। তিনি বিশ্বাস করেন, এই কাজের জন্য তাকে একদিন না একদিন স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করতেই হবে। এভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা যুগে যুগে মানবসমাজে অপরাধ দমনে অদৃশ্য ঢাল হিসেবে কাজ করে এসেছে। কিন্তু আজকে একদিকে ধর্মের সেই সঠিক শিক্ষা যেমন হারিয়ে গেছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে মানুষের অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেবল শক্তি প্রয়োগের উপর নির্ভর করা হচ্ছে। মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী আদর্শ যেমন আমাদের ধর্মীয় গুরুদের কাছে নেই, তেমনি আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার রাষ্ট্রীয় কোনো পদক্ষেপও এখানে নেই। ফলে শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগের একমুখী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

আজকে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধার করার কাজে। কোনো শ্রেণির কাছে ধর্ম হয়ে গেছে রুটি-রুজির হাতিয়ার, কোনো শ্রেণির কাছে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের হাতিয়ার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর হাতিয়ার। যে ধর্ম এসেছিল মানবজাতিকে শান্তি দেওয়ার জন্য সে ধর্মই আজ হয়ে উঠেছে অশান্তির কারণ। ধর্মীয় বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষকে জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় একমাত্র হেযবুত তওহীদ নিঃস্বার্থভাবে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করে যাচ্ছে। মানুষকে যাবতীয় অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে এবং সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এ আন্দোলনের সদস্যরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এ কাজ করতে গিয়ে আমরা বহু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছি কিন্তু থেমে থাকি নি। আমরা বিশ্বাস করি, অন্যায় অশান্তিপূর্ণ একটি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্তই হচ্ছে ঐ সমাজের বাসিন্দাদেরকে ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা, তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা, তাদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হেযবুত তওহীদের সাম্প্রতিক কার্যক্রম:

বর্তমান বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় বিভীষিকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে জঙ্গিবাদী মতাদর্শ। ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা থেকে জন্ম নেওয়া জঙ্গিবাদকে ইস্যু বানিয়ে একটির পর একটি দেশ ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমা অস্ত্রব্যবসায়ী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী সুকৌশলে তাদের স্বার্থ উদ্ধারে জঙ্গিবাদকে ব্যবহার করে যাচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এ পশ্চিমা

ষড়যন্ত্রের বাইরে নয়। আমরা শুরু থেকেই বলে এসেছি, যেহেতু ধর্মীয় বিকৃত ব্যাখ্যা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ জঙ্গিবাদী মতাদর্শে আকৃষ্ট হচ্ছে, তাই জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করার জন্য শক্তিপ্রয়োগের পাশাপাশি এর বিরুদ্ধে আদর্শিক মোকাবেলা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে সকলেই আমাদের এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই জঙ্গিবাদের বিপরীতে ধর্মের সঠিক আদর্শ তুলে ধরার জন্য এবং সরকারের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য দেশের আপামর জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। গত কয়েক বছরে আমরা সারা দেশে লক্ষাধিক জনসভা, সেমিনার, পথসভা, র‍্যালি ইত্যাদি করেছি। আমরা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করছি, পুস্তক-পুস্তিকা, ম্যাগাজিন, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদির মাধ্যমে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আদর্শিক প্রেরণা জাগ্রত করে যাচ্ছি। আমরা ধর্মব্যবসায়ী উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর কূপমণ্ডূকতা ও সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ষোল কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এখনো কাজ করে যাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদীরা অস্ত্রব্যবসাকে তাদের অর্থনীতির মূল উৎসে পরিণত করেছে। তারা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিয়ে সেখানে অস্ত্রের বাজার বসাতে চায়। আমাদের দেশটাও যেন তাদের ষড়যন্ত্রের রঙ্গমঞ্চে পরিণত না হয় সেজন্য যে আদর্শ দরকার সেটা আল্লাহ দয়া করে বাংলার মাটিতে দান করেছেন। আমরা সেটাই মানুষের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। এ কাজে আমাদের কোনো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার অভিসন্ধি নেই। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের যেসব কর্মকর্তাগণ ঘনিষ্ঠভাবে হেযবুত তওহীদকে দেখেছেন তারা এটা জানেন। তারা হেযবুত তওহীদের কার্যক্রম পরিচালনায় দীর্ঘদিন ধরেই সহযোগিতা করে আসছেন।

সীমাহীন অপপ্রচারের শিকার হেযবুত তওহীদঃ

ধর্মের সঠিক রূপ মানুষের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে স্বভাবতই আমাদেরকে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন অধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলতে হয়েছে। এতে যাদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত লেগেছে তারা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালিয়েছে। তারা ওয়াজে, খুৎবায় হেযবুত তওহীদকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের এজেন্ট, কাফের, মুরতাদ, তাদেরকে হত্যা করা বৈধ ইত্যাদি মিথ্যা ফতোয়াবাজি ও আইনবিরোধী বক্তব্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এসেছে। এমনকি তারা উগ্রপন্থী সন্ত্রাসীদের জড়ো করে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, হামলা করে বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, সবকিছু লুটে নিয়েছে, পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে, এমন কি প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের নারী-পুরুষদেরকে পিটিয়ে জবাই করে হত্যাও করেছে। ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ঈমানকে হাইজ্যাক করে এ ধরনের পাশবিক ঘটনা কারা ঘটাতে পারে তা আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন।

এদের পাশাপাশি ইসলামবিদ্বেষী গণমাধ্যকর্মীরাও আমাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে অপপ্রচার চালিয়ে গেছে। হেযবুত তওহীদের নাম শুনেই তারা এ আন্দোলন সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে নিয়েছেন। এ আন্দোলনের নীতিমালা, কর্মসূচি কী তা খোঁজ নিয়ে দেখারও প্রয়োজন তারা বোধ করেন নি। যখন জঙ্গিবাদের প্রসার ঘটল তখন পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোর অনুকরণে দেশীয় গণমাধ্যমগুলোও গড়পড়তায় সব ইসলামী নামের সংগঠনকে জঙ্গিবাদী বলে প্রচার করতে শুরু করল। প্রায়ই যে জঙ্গি দলগুলোর তালিকা প্রচার করতে লাগলেন সেখানে কোনো তথ্য-যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই হেযবুত তওহীদের নাম ঢুকিয়ে দিতে থাকলেন। 'হেযব' শব্দের অর্থ দল। যে কোনো সংগঠনের নাম যদি আরবিতে রাখা হয়, এ শব্দটি ব্যবহার করা হতেই পারে। যেমন বহু দলের নামের মধ্যেই পার্টি, লীগ ইত্যাদি বিদেশি শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে হিজবুত তাহরীর নামে একটি সংগঠন নিষিদ্ধ হয়েছে। এ দলটির নামের সাথে আমাদের আন্দোলনের নামের আংশিক মিল থাকায় অন্ধ সংবাদকর্মীগণ হেযবুত তওহীদকেও একই কাতারে ফেলে হাজার হাজার পরিকল্পিত মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছেন, যার কাটিং আমাদের কাছে আছে।

অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছে প্রশাসনঃ

হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে এই অবিশ্রান্ত অপপ্রচারে প্রশাসন, আইন-আদালতসহ সর্বস্তরের মানুষের মনে ব্যাপক নেতিবাচক ধারণা গেড়ে বসেছে। যেখানেই আমাদের সদস্যরা প্রচারকাজ করতে গেছেন সেখানেই কেউ না কেউ তাদেরকে ভুল বুঝেছে। তাদেরকে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়েছে, গ্রেফতার করানো হয়েছে, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। সংবাদকর্মীরা আমাদের সদস্যদের বুকে নেমপ্লেট আর হাতকড়া পরানো ছবি পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছেন। তারা আসলে দোষী না নির্দোষ সেটা জানার সময়ও তাদের ছিল না। থানাতেও তাদের বহু নির্যাতন করা হয়েছে। তারপর তাদেরকে কোর্টে চালান দিয়ে শুরু হয় তদন্ত। তদন্তে বরাবরই তারা নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বে-কসুর খালাস পেয়েছেন।

তাদের গ্রেফতারের সংবাদ প্রচার করে তাদেরকে সংবাদকর্মীরা সামাজিকভাবে নিদারুণ অপদস্থ করলেও তাদের নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তিলাভের সংবাদটি আর তারা প্রচার করেন নি। একটি মিথ্যা কথা যখন বারবার মিডিয়ায় আসে তখন সেটা মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। এভাবে বিগত ২২ বছরে করা পাঁচ শতাধিক মামলার একটিতেও আমরা দোষী প্রমাণিত হই নি। এভাবে আমাদেরকে সীমাহীন হয়রানি করার পর প্রশাসনের কর্মকর্তারা এ আন্দোলন সম্পর্কে সত্যটি জানতে পেরেছেন। আজ আমরা সারা দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলা, গ্রামে-নগরে-বন্দরে যখন জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মব্যবসা, অপরাজনীতি, ধর্মের নামে হুজুগের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাগুলো তুলে ধরছি, দেখা যাচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ আমাদের অনুষ্ঠানগুলোতে সহযোগিতা করছেন।

হেযবুত তওহীদের মূলনীতি:

হেযবুত তওহীদের সূচনালগ্নে এর প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী যে মূলনীতিগুলো গ্রহণ করেন সেগুলো আপনাদের জানা জরুরি, কারণ এগুলোই আন্দোলনের সকল কর্মকাণ্ডের মূলসূত্র।

(ক) হেযবুত তওহীদ তার চলার পথে রসুলাল্লাহর প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করবে।

(খ) আন্দোলনের কোনো গোপন কার্যক্রম থাকবে না, সবকিছু হবে প্রকাশ্য। প্রতিটি কাজ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবগতিক্রমে করতে হবে যেন ভুল বোঝার কোনো সুযোগ না থাকে।

(গ) হেযবুত তওহীদের কোনো সদস্য কোনো আইনভঙ্গ করবে না, অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না। যদি যায় তাহলে আন্দোলনের কর্তৃপক্ষই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।

(ঘ) আন্দোলনের বাইরের কারো অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

(ঙ) হেযবুত তওহীদ কখনও প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবে না।

(চ) কর্মক্ষম কেউ বেকার থাকতে পারবে না, প্রত্যেকে বৈধ উপায়ে রোজগারের চেষ্টা করবে।

(ছ) ইসলামের কাজের কোনো বিনিময় কেউ গ্রহণ করতে পারবে না।

আইন মান্য করার ক্ষেত্রে হেযবুত তওহীদের অনন্য রেকর্ড:

আজ পর্যন্ত আমরা এই যে নীতিমালাগুলোর একচুলও ব্যতিক্রম করি নি। আমরা আজ পর্যন্ত কোথাও দাবি আদায় বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে দেশের সম্পদ বিনষ্ট করি নি, জ্বালাও পোড়াও করি নি। সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে, নিঃস্বার্থভাবে দেশ, জাতি, ধর্ম ও মানবতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে এমন দ্বিতীয় কোনো সংগঠন বাংলাদেশে রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। শুধুমাত্র তাই নয়, হেযবুত তওহীদ এমন একটি সংগঠন যার সদস্যরা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বছরে একটিও অপরাধ করে নি, একটিও আইনভঙ্গ করে নি। এটা আমাদের দাবি নয়, এটা প্রশাসনের তদন্ত কর্মকর্তাদের আদালতে দাখিলকৃত তদন্ত রিপোর্টের সারমর্ম। এর পক্ষে নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যন্ত সকল আদালতের দলিল আমরা দেখাতে পারব। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর চিত্র আপনাদের সামনে রয়েছে, সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার চিত্রও আপনাদের সামনে রয়েছে যারা হাজার হাজারবার বিবিধ অপরাধ, দুর্নীতি, খুন ইত্যাদির দরুন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, হেযবুত তওহীদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার গৌরবময় অবস্থান সম্পর্কে যারা জানেন তারা কোনোরূপ অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

তথাপি আমরা আজও হয়রানির শিকার:

দুর্ভাগ্যজনক বিষয় এখানেই। এখনও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি অংশ হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে অপপ্রচারে প্রভাবিত, অথবা তারা আইনের দৃষ্টি দিয়ে না দেখে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার ভিত্তিতে হেযবুত তওহীদকে পরিমাপ করেন। আমরা একই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন বিপরীতমুখী পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। হয়তো একটি জেলায় আমাদেরকে প্রশাসন খুব সহযোগিতা করছে। হঠাৎ নতুন কোনো কর্মকর্তা এসে কাজই বন্ধ করে দিলেন। যখন ঢাকা মহানগরীতে আমরা বড় বড় জনসভা করে যাচ্ছি তখন ঢাকারই কোনো একটি থানায় সেমিনার করারও অনুমতি মিলছে না। অর্থাৎ এটা সুস্পষ্ট যে আমাদের বিষয়ে প্রশাসনের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি (Consistent Policy) নেই। একজন কর্মকর্তার অজ্ঞতাপ্রসূত সন্দেহ বা প্রচেষ্টাই আমাদের বিরাট জনসভার আয়োজনকেও শেষ মুহূর্তে পণ্ড করে দিতে পারে। আমরা যেখানে একশটি অনুষ্ঠানের অনুমতি চাই, সেখানে একটার অনুমতি পাই। কিন্তু হওয়ার কথা ছিল উল্টো। কেননা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ-র‍্যাব ইত্যাদি বাহিনীর প্রধানগণ বার বার জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তখন আমরা ছুটে গেছি। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে প্রশাসনের মধ্য থেকেই যখন বিরূপ আচরণ পাই তখন বিস্মিত না হয়ে পারি না।

আমরা কাজ করতে পারি পারস্পরিক আস্থার

ভিত্তিতেঃ

আগেই বলেছি, শুধুমাত্র দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে মানুষের অপরাধ প্রবণতা দূর করা যায় না। তার জন্য ধর্মের সঠিক শিক্ষা, মূল্যবোধ, আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতার জাগরণ প্রয়োজন। অন্যদিকে জঙ্গিবাদের মতো বৃহৎ সংকট মোকাবেলায় এই আদর্শিক মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে প্রয়োজন পড়ে একটি সঠিক পাল্টা আদর্শ (Counter Narrative)। সেই আদর্শটি আল্লাহর রহমতে আমাদের কাছে আছে। আমরা চাই দেশ ও জাতি এটা প্রয়োগ করে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভ করুক। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ ধর্ম ও রাজনীতির নামে চলা সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। তারা জানতে পারছে কীভাবে ধর্মের নামে প্রতারণা করে তাদের সম্পদ হরণ করেছে একটি গোষ্ঠী, কীভাবে তাদের ঈমানী চেতনাকে ভুল খাতে নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছে ধর্মব্যবসায়ী অপরাজনীতিকরা। আমাদের বক্তব্য যাদের হৃদয়ে সত্যের ঝঙ্কার তুলছে, তারা দেশ ও জাতিকে রক্ষায় নিঃস্বার্থ ভূমিকা রাখতে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। আমরা চাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং হেযবুত তওহীদ পারস্পরিক আস্থার মধ্যে থেকে কাজ করে যাবে। বাহিনীগুলোর কাছে রয়েছে শক্তি, আমাদের কাছে রয়েছে আদর্শ। আমরা যদি পরস্পর সহযোগী হিসেবে কাজ করে যেতে পারি, তাহলে তা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অনন্য শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমরা দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ না করার নীতি থেকে কখনোই বিচ্যুত হবো না ইনশা'ল্লাহ। আমাদের সম্পর্কে জানার জন্য হাজারটা পথ খোলা আছে। আমাদের জনসভার অনেক ভিডিও, বই, পত্রিকা ইত্যাদি ওয়েবসাইটে আছে। দেশের প্রায় পঞ্চাশটি জেলা-শহরে আমাদের কার্যালয় রয়েছে। সুতরাং হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির কোনো অবকাশই নেই।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট আমাদের প্রত্যাশাঃ

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দেশের কল্যাণকামী নাগরিকদের বন্ধু। আমরা দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ চাই। মাননীয় এমামুয্‌যামান আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে মানুষের মূল এবাদত। সারা বিশ্বে যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল বেজে উঠেছে, যখন মুসলিম দেশগুলোও বিভিন্ন সামরিক জোটে যোগদান করছে, তখন আমাদের এই সবুজ শ্যামল দেশটিকে রক্ষা করার একটি পথ আমরা আমরা প্রস্তাব করছি। আমাদের আশা থাকবে আমাদের প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হোক।

আমরা যেন মানুষকে এ প্রবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগ্রত করতে তুলতে পারি, সেজন্য আমাদের বিষয়ে প্রশাসনের মধ্যে একটি সুসমন্বিত নীতি থাকা অপরিহার্য বলে মনে করি। আমরা চাই আপনারা অতি দ্রুত আমাদের বিষয়ে সেই নীতি গ্রহণ করবেন, দেশের সকল থানায় সেই নীতিই অনুসরণ করা হবে। আমরা যদি অন্যায় করি, আমাদেরকে আইনে সোপর্দ করা হোক। কিন্তু যদি আমরা দেশের জন্য কল্যাণকর হই, তাহলে আমাদের চলার পথকে সুগম ও কণ্টকমুক্ত করা হোক। আমাদের সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিন্ত হোন, সন্দেহমুক্ত হোন। "হেযবুত তওহীদ এখন তো ভালো কথা বলছে, ভালো কাজই করছে, কিন্তু ভবিষ্যতে না জানি কী করে ফেলে?" - এ ধরনের অহেতুক সন্দেহ অন্তত আমাদের ব্যাপারে করবেন না। সবাইকে এক পাল্লায় মাপার নীতি অবশ্যই অযৌক্তিক। তাহলে জগতে ভালো-মন্দ, আসল-নকল বলে কোনো কিছু থাকত না। কারা প্রকৃতপক্ষে দেশের মানুষের কল্যাণ চায়, ঐক্য চায়, কারা শত্রুদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে চায়, অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র থেকে মানুষকে নিরাপদ করতে চায় তা অবশ্যই আপনাদের সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করতে হবে। ভালো কাজকে উৎসাহিত করা এবং মন্দকে দমন করাই রাষ্ট্রের নীতি হওয়া উচিত।

আমরা আমাদের দেশে প্রচলিত আইন ভঙ্গ না করার নীতি থেকে কখনোই বিচ্যুত হবো না ইনশা'ল্লাহ। আমাদের সম্পর্কে জানার জন্য হাজারটা পথ খোলা আছে। আমাদের জনসভাগুলোর অনেক ভিডিও অনলাইনে আছে, আমাদের লেখা বইগুলো, পত্রিকাগুলো ওয়েবসাইটে আছে। দেশের প্রায় পঞ্চাশটি জেলা-শহরে আমাদের কার্যালয় রয়েছে। সুতরাং আমাদের বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির কোনো অবকাশই নেই।

মহানবী (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য কী?

কাজী আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ

বর্তমানের শতধাবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত, হানাহানিতে লিপ্ত, হাজারো রকমের আকিদায় বিভক্ত, অন্য জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত অপমানিত আক্রান্ত মুসলমান জাতির এ বিষয়টি জানা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে যে তারা নিজেদেরকে যাঁর উম্মত বলে বিশ্বাস করেন তাঁর অর্থাৎ মোহাম্মদ (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য কী ছিল? এটা যদি মুসলমানদের কাছে সুস্পষ্ট থাকে তাহলে তাঁর হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড, ধর্মব্যবসা, অপরাজনীতি করার কোনো সুযোগ থাকবে না। তাঁর সমগ্র জীবনের এই যে কোরবানি, সাহাবিদের কোরবানি, শাহাদাত সব কিছুর বিনিময়ে তিনি কী করতে চেয়েছেন, তাঁর পবিত্র জীবনকে প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত পুরো ঘটনা সামগ্রিকভাবে এক দৃষ্টিতে দেখার নাম আকিদা। খণ্ডিতভাবে, বিক্ষিপ্তভাবে দেখলে হবে না।

তিনি কি সাম্রাজ্যবিস্তার করতে এসেছেন, তিনি কি অন্য ধর্মের লোকদেরকে জোর করে ধর্মান্তরিত করতে এসেছেন, অন্যদের ধন সম্পদ জোরপূর্বক দখল করতে এসেছেন, নাকি অন্য কোনো কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে এসেছেন? (নাউযুবিল্লাহ!) যে বিষয়গুলো নিয়ে গত কয়েক শতাব্দী থেকে ইসলামের শত্রুরা বিষোদ্গার করে এসেছে, মিথ্যা বানোয়াট আজগুবি সব মতবাদ প্রচার করে দিয়ে ঘৃণা বিস্তার করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস করছে।

কাজেই আমাদের পরিষ্কারভাবে জানা দরকার যে আমাদের শেষ রসুল আসলে কী জন্য এসেছেন? হ্যাঁ, তিনি সেনাবাহিনী গঠন করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, সন্ধি করেছেন, আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন, বিচার করেছেন, ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন, সাংসারিক জীবনযাপনও করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে একটি ঐক্যবদ্ধ উদীয়মান জাতির জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা, ছিলেন বিচারক, ছিলেন সেনাপ্রধান, ছিলেন পরিবারের কর্তা। এই যে তার প্রচণ্ড গতিময়, কর্মব্যস্ত জীবন, সেখানে তিনি কোন কাজ কখন কেন কোন পরিপ্রেক্ষিতে করেছেন এবং ঐ কাজগুলোর উদ্দেশ্য কী ছিল এটা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জানাই হচ্ছে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ও সুন্নাহ সম্পর্কে প্রকৃত আকিদা।

ইসলামের শত্রুরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাঁর কর্মময় জীবনের এখান থেকে একটি ঘটনা, ওখান থেকে একটি ঘটনা এনে গোজামিল, জোড়াতালি দিয়ে রসুল সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা দাঁড় করিয়ে দেয়। তারা এটা করেন মুসলিম জাতির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আর ধর্মের ধ্বজাধারীরা, ধর্মব্যবসায়ীরা করেন নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। তারা রসুলাল্লাহর জীবনের অতি ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোকে মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করে জাতির দৃষ্টি থেকে রসুলাল্লাহর আগমনের মূল উদ্দেশ্যকেই আড়াল করে ফেলেছেন। তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত উপাধি কী লক্ষ করুন- রহমাতাল্লিল আলামিন, সমস্ত বিশ্বজাহানের জন্য রহমতস্বরূপ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সমস্ত মানুষকে সুখ শান্তিময়, শোষণ-অবিচারহীন একটি জীবন উপহার দেওয়াই তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য।

পবিত্র কোর'আনের অন্তত তিনটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তিনি হেদায়াহ ও সত্যদীন সহকারে স্বীয় রসুল প্রেরণ করেছেন যেন তিনি একে অন্যান্য সকল জীবনব্যবস্থা, দীনের উপর বিজয়ী করেন (সুরা সফ ৯, সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮)। সুতরাং বোঝা গেল আল্লাহর প্রেরিত হেদায়াহ (সঠিক পথ) ও সত্যদীনকে সমগ্র মানবজাতির জীবনে প্রতিষ্ঠা করা তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রথম কী করলেন? সবাইকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ মানুষকে এক আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। শুরুতেই কাবাকেন্দ্রিক পুরোহিত ও ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচারের দরুন তিনি প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন।

একদিন রসুলাল্লাহর চাচা তাঁকে ডেকে বললেন, "আমার কাছে মক্কার নেতারা এসেছিলেন। তাদের দাবি হচ্ছে তুমি মানুষকে যা বলছ সেগুলো আর বলবে না। তার বিনিময়ে তারা তোমাকে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছে। তুমি কি আরবের বাদশাহ হতে চাও? তারা তোমাকে আরবের বাদশাহ বানিয়ে দেবে। তুমি যদি চাও তারা তোমাকে আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীকে এনে দেবে। অথবা তুমি যদি চাও তোমাকে আরবের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসক দিয়ে তোমার চিকিৎসা করাবো। আর যদি তুমি তাদের প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাহলে তারাই আগামীকাল তোমার ব্যাপারে ফায়সালা করবে (অর্থাৎ হত্যা করবে)।

এ প্রস্তাবনা শুনে রসুলাল্লাহ দৃপ্তস্বরে উত্তর দিলেন, "চাচা, আপনি তাদের বলে দিবেন, তারা যদি আমার এক হাতে চন্দ্র আর আরেক হাতে সূর্যও এনে দেয় তবু আমি আমার এ পথ ছাড়ব না। হয় আল্লাহর বিজয় হবে নয় এ পথে মোহাম্মদ শেষ হয়ে যাবে।" (সিরাত ইবনে ইসহাক) লক্ষ্য করুন, এখানে আল্লাহর রসুলের জীবনের উদ্দেশ্যটি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যদি ক্ষমতা চাইতেন, ভোগবিলাস চাইতেন তো বাদশাহী ও সুন্দরী নারীর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন সেটা হচ্ছে আল্লাহর বিজয়। তিনি মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করলেন, বিপদসঙ্কুল সংগ্রামী জীবন বেছে নিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর বিজয় হবে কীসে? অপর দুটো ঘটনায় এ প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজে পাব।

একজন নির্যাতিত সাহাবী রসুলের কাছে এসে বললেন, ইয়া

রসুলাল্লাহ! আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি দোয়া করেন তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু রসুল কাফেরদের ধ্বংস কামনা করেন নি। এখানেই প্রমাণ হয়ে যায় যে তিনি মানুষকে ধ্বংস করার জন্য আসেন নি, তিনি তাদেরকে দুর্দশা থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন। তিনি জবাবে বললেন, শোনো, সেদিন বেশি দূরে না, যেদিন একজন যুবতী সুন্দরী মেয়ে সারা গায়ে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় সানা থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত পথ রাতের অন্ধকারে হেঁটে যাবে। তার মনে আল্লাহ ও বন্যপ্রাণীর ভয় ছাড়া আর বিপদের আশঙ্কাও জাগ্রত হবে না। অর্থাৎ রসুলাল্লাহ একটি শান্তিময় সমাজব্যবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। একটি সমাজের শান্তিময়তা বোঝার জন্য এর চেয়ে বড় কোনো নির্দেশক থাকতে পারে না। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি পরম শত্রুকেও ক্ষমা করে দিলেন। তারপর তিনি বেলালকে (রা.) কাবার উপরে উঠিয়ে আজান দেওয়ালেন। সেই বেলাল কোন বেলাল? সেই কোরায়েশদের দ্বারা অত্যাচারিত নিপীড়িত বেলাল, যার কোনো বলার অধিকার ছিল না, বিনোদনের অধিকার ছিল না, যাকে জন্তুর মতই ব্যবহার করা হতো। তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের বঞ্চিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের প্রতীক। সেই ক্রীতদাস বেলালকে তিনি কাবার উপরে উঠালেন। উঠিয়ে প্রমাণ করে দিলেন মানুষ ঊর্ধ্বে মানবতা ঊর্ধ্বে। মানুষকে সর্বোচ্চ আসনে উঠানোর জন্যই তিনি এসেছিলেন। এখানেই ঘটেছে রসুলাল্লাহর 'রহমতাল্লিল আলামীন' নামের বহিঃপ্রকাশ।

বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি বললেন, আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সমস্ত বৈষম্যের উঁচু নিচু দেয়াল তিনি ভেঙ্গে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা যা খাবে তোমাদের অধীনস্থদেরও তাই খাওয়াবে, যা পরবে তা-ই তাদেরকে পরাবে। গোটা জাতিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করলেন, সুশৃঙ্খল করলেন, সত্যের পক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ করলেন। তিনি যেমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন তার ফল হলো যে একজন মেয়ে একা রাতের অন্ধকারে হেঁটে যেতে পারত। মানুষ উটের পিঠভর্তি করে খাদ্য, সম্পদ নিয়ে দরিদ্র মানুষের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াত। রাস্তায় একটি মূল্যবান বস্তু হারিয়ে ফেললে সেটা খুঁজে যথাস্থানেই পাওয়া যেত। দোকান খোলা রেখে মানুষ মসজিদে যেত, বছরের পর বছর আদালতে কোনো অপরাধসংক্রান্ত মামলা আসত না। সেখানে পথচারীদের খাওয়ার জন্য রেস্তোরা বসানো হতো না, বসানো হতো সরাইখানা। স্থানীয় লোকেরা তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য, ফলফলাদি, গৃহপালিত পশু সরাইখানাতে দিয়ে যেত যেন মুসাফির আর ক্ষুধার্তরা এসে খেতে পায়। একজন নিঃস্ব মানুষ দেশ ভ্রমণে বের হতো, কোথায় তার আশ্রয়ের সঙ্কটে পড়া তো দূরের কথা, সে মানুষের কাছ থেকে উপহার উপঢৌকন নিয়ে ধনী মানুষ হয়ে বাড়ি ফিরত।

রসুলাল্লাহ এন্তেকালের সময় পার্থিব সম্পদ হিসাবে কী রেখে গেছেন সেটা সর্বজনবিদিত। সেগুলো হচ্ছে (১) ১টি চাটাই, (২) ১ টি বালিশ (খেজুরের ছাল দিয়ে ভর্তি) ও (৩) কয়েকটি মশক। আরও রেখে যান– (১) ৯টি তরবারী, (২) ৫টি বর্শা, (৩) ১টি তীরকোষ, (৪) ৬টি ধনুক, (৫) ৭টি লৌহবর্ম, (৬) ৩টি জোব্বা (যুদ্ধের), (৭) ১টি কোমরবন্ধ, (৮) ১টি ঢাল এবং (৯) ৩টি পতাকা। (তথ্যসূত্র:- সিরাতুন্নবী- মওলানা শিবলী নোমানী)। তিনি যদি পার্থিব কোনো স্বার্থে সংগ্রাম করতেন তাহলে তাঁর ইন্তেকালের পর সেটার অবশ্যই নমুনা পাওয়া যেত। কিন্তু সিরাত গ্রন্থগুলো থেকে আমরা দেখি- সারা জীবন তিনি যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন সেই সংগ্রামের হাতিয়ার আর পার্থিব সম্পদ বলতে কেবল চাটাই, বালিশ আর মশক পাওয়া যায়, যা একেবারেই নিত্য ব্যবহার্য। সোনাদানা, হীরা, জহরত কিছুই তিনি রেখে যাননি।

রসুলাল্লাহ এন্তেকালের সময় কী রেখে গেছেন সেটা সর্বজনবিদিত- (১) ১টি চাটাই, (২) ১ টি বালিশ (খেজুরের ছাল দিয়ে ভর্তি) ও (৩) কয়েকটি মশক। আরও রেখে যান– (১) ৯টি তরবারী, (২) ৫টি বর্শা, (৩) ১টি তীরকোষ, (৪) ৬টি ধনুক, (৫) ৭টি লৌহবর্ম, (৬) ৩টি জোব্বা (যুদ্ধের), (৭) ১টি কোমরবন্ধ, (৮) ১টি ঢাল এবং (৯) ৩টি পতাকা। (তথ্যসূত্র:- সিরাতুন্নবী- মওলানা শিবলী নোমানী)। তিনি যদি পার্থিব কোনো স্বার্থে সংগ্রাম করতেন তাহলে তাঁর ইন্তেকালের পর সেটার অবশ্যই নমুনা পাওয়া যেত। কিন্তু সিরাত গ্রন্থগুলো থেকে আমরা দেখি- সারা জীবন তিনি যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন সেই সংগ্রামের হাতিয়ার আর পার্থিব সম্পদ বলতে কেবল চাটাই, বালিশ আর মশক পাওয়া যায়, যা একেবারেই নিত্য ব্যবহার্য। সোনাদানা, হীরা, জহরত কিছুই তিনি রেখে যাননি।

সুতরাং মানুষের মুক্তিই হচ্ছে রসুলাল্লাহর (সা.) আগমনের উদ্দেশ্য, সকল নবী রসুলের আগমনের উদ্দেশ্য। এটাই ইসলামের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য (আকিদা) যার সামনে থাকবে, সে আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে ইসলামের নাম বলে চালিয়ে দিতে পারবে না। পাশাপাশি ইসলাম বিদ্বেষীদের সকল অপপ্রচারও ভিত্তিহীন ও যুক্তিহীন হয়ে যাবে। তাই এখন সকলের জন্যই রসুলাল্লাহর আগমনের সঠিক উদ্দেশ্যটি জানা অত্যন্ত জরুরি।

ইসলামের উদ্দেশ্য কী সেটা পরবর্তী পর্বে লেখার আশা রইল।

তওহীদ জান্নাতের চাবি

তওহীদবিহীন কোনো আমলই আল্লাহ গ্রহণ করবেন না

কামরুল আহমেদ

যদি প্রশ্ন করা হয় জাহান্নামের কোনো প্রকার আজাবের স্পর্শ ব্যতিরেকে একজন মানুষ খুব সহজেই জান্নাতে যাবে কী করে? এর উত্তর হবে, একমাত্র তওহীদ গ্রহণের মাধ্যমে। এ মহা মূল্যবান তওহীদ আল্লাহ আদম (আ.) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবী-রসুলকে দান করেছেন। আল্লাহর রসুল এই তওহীদকেই জান্নাতের চাবি বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "জান্নাতের চাবি হচ্ছে- আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা (এলাহ) নেই" (মুয়াজ বিন জাবাল থেকে আহমদ, মেশকাত)। এই উপমা দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কোনো আমল দিয়েই মানুষ জান্নাতের বন্ধ দুয়ার খুলতে পারবে না। কেবল তওহীদই মানুষকে জান্নাতে নিতে পারবে।

তাহলে প্রশ্ন আসে, আমল অর্থাৎ নামাজ রোজা ইত্যাদি করে কী হবে?

হ্যাঁ, এর উত্তর হচ্ছে, আমল দিয়ে জান্নাতের স্তর নির্ধারিত হবে। একজন মো'মেন জান্নাতে যাওয়ার পর জান্নাতের অসংখ্য স্তরের মধ্যে কোন স্তরে অবস্থান করবে সেটা নির্ধারিত হবে তার আমলের ভিত্তিতে। স্তরবিন্যাসের সময় তার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমলও আল্লাহ পরিমাপ করবেন। আল্লাহ বলেছেন, "মানুষ দুই প্রকার- মো'মেন ও কাফের (সুরা তাগাবুন ২)। এই মো'মেন হচ্ছে যারা তওহীদে থাকবে (আল্লাহর হুকুমকে স্বীকার করবে) এবং কাফের হচ্ছে যারা তওহীদ (আল্লাহর হুকুমকে) অস্বীকার করবে। হাশরের দিন শুরুতেই আল্লাহ গোটা মানবজাতিকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে ফেলবেন। তিনি বলবেন, "হে অপরাধীরা! আজকে তোমরা পৃথক হয়ে যাও (সুরা ইয়াসীন ৫৯)। একভাগে থাকবে তারা যারা তওহীদে ছিল, অপরভাগে তারা থাকবে যারা তওহীদে ছিল না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকে মুসলমান জাতি লক্ষ প্রকার আমল করে যাচ্ছে কিন্তু তারা তওহীদেই নেই। তারা আল্লাহর পরিবর্তে পশ্চিমা বস্তুবাদী দাজ্জালীয় সভ্যতার হুকুমবিধানকে বরণ করে নিয়েছে।

তওহীদের গুরুত্ব:

এর গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আল্লাহর রসুল কী বলেছেন খেয়াল করুন। তিনি একদিন আবুযর গেফারিকে (রা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই ঘোষণা দিল যে আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করল।" আবুযর (রা.) বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "রসুলাল্লাহ! যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে?" রসুলাল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ, যদি সে চুরি ও ব্যভিচার করে তবুও জান্নাতে দাখিল হবে।" আবুযর (রা.) বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য বার বার একই প্রশ্নই করতে থাকলেন। চারবার একই উত্তর দেওয়ার পর, রসুলাল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ, সে জান্নাতে যাবে যদি সে চুরি করে, যদি সে ব্যভিচার করে এমন কি যদি মাটিতে আবু যারের নাক ঘষেও দেয়।" (আবুযর গেফারি রা. থেকে বোখারি)।

মৃত্যুদণ্ডের পরে ইসলামের সবচেয়ে কঠিন দণ্ড হচ্ছে চুরি আর ব্যভিচারের। যারা এই দুটো জঘন্য অপরাধও করবে তাদেরকেও আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না, যদি সে একমাত্র আল্লাহকেই তার হুকুমদাতা হিসাবে বিশ্বাস ও মান্য করে। বিশ্বনবী পরিষ্কারভাবে বলেছেন, আল্লাহর সাথে তার বান্দার চুক্তি (contract) এই যে, বান্দা তার পক্ষ থেকে যদি এই শর্ত পালন করে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ অর্থাৎ বিধাতা বলে স্বীকার করবে না- তবে আল্লাহও তাঁর পক্ষ থেকে এই শর্ত পালন করবেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (হাদিস- মুয়ায রা. থেকে বোখারী, মুসলিম মেশকাত)।

একটি হাদিসে কুদসি রয়েছে যেখানে রসুলাল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ বলেন, হে বনি আদম! হে বনি আদম! যদি তোমার গুনাহ আকাশের মেঘমালার মতো

বিপুল পরিমাণও হয়, তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমার সে গুনাহ মাফ করে দেবো এবং সে জন্য আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ বিশাল গুনাহরাশি নিয়েও আমার দিকে ফিরে আসো এবং আমার সাথে আর কাউকে শরিক না করো, তাহলে আমিও তোমার প্রতি পৃথিবী পরিমাণ বিশাল ক্ষমা নিয়ে হাজির হবো [আনাস (রা.) থেকে তিরমিযি]"। এখানেও ঐ একই শর্ত- আল্লাহর সাথে শরিক করা যাবে না অর্থাৎ তওহীদে থাকতে হবে।

রসুলাল্লাহর নবুয়তি জীবনের তেইশ বছরের তের বছরই কেটেছে তওহীদের ডাক দিয়ে। প্রথমে তিনি কোনো আমলের দাবিই করেন নি। তিনি কেবল একটা কথাই বলেছেন, হে আরব জাতি! তোমরা যদি একটা কথা স্বীকার করো পৃথিবী তোমাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম, কর্তৃত্ব আমরা মানব না। মক্কার কাফেরদের আপত্তিই ছিল তওহীদ নিয়ে। দ্বন্দ্বটাই এখানে যে কার সার্বভৌমত্ব চলবে, আল্লাহর না মানুষের। সালাহ-সওম নিয়ে কোনো নির্যাতন নিপীড়ন হয় নি, কারণ ওগুলোর হুকুমই তখন আসে নি।

তওহীদের এত গুরুত্ব কেন?

তওহীদের গুরুত্ব বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে এই তওহীদের মানে কী? এর মধ্যে কী এমন কথা আছে যার দরুণ সমস্ত গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন? জেনা চুরিও ক্ষমা করে দেবেন। অসংখ্য নবী-রসুল এই কথাটির কারণে অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করেছেন। শেষ নবীও নির্যাতনে জর্জরিত হয়েছেন। তিনি কোনো আমলের দাওয়াত দেন নি যে আমলের জন্য তাকে নির্যাতন করা হবে। তাকে নির্যাতন করাই হয়েছে তওহীদের জন্য। সেই তওহীদটা কী? সেটা হচ্ছে, ছোট্ট একটি বাক্য "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ"। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা, বিধানদাতা নেই। এক কথায় সার্বভৌমত্ব, সর্বময় কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে- আল্লাহর হাতে নাকি মানুষের হাতে? বর্তমানে এই কলেমার ইলাহ শব্দের অর্থ মা'বুদ করা হয়। কিন্তু মা'বুদ আরবি শব্দ, ইলাহও আরবি শব্দ। দুটো শব্দই কোর'আনে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন। মাবুদ অর্থ উপাস্য, তিনি সেই সত্তা যার এবাদত, উপাসনা করতে হবে (He who is to be worshiped)।

আর ইলাহ শব্দের অর্থ তিনি সেই সত্তা যার হুকুম, আদেশ মানতে হবে (He who is to be obeyed)। আল্লাহ ইলাহ এবং মাবুদ উভয়ই। কিন্তু কলেমায়, তওহীদে কেবল ইলাহ হিসাবে মেনে নেওয়ার জন্য দাবি করা হয়েছে। আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে মানার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার একটি চুক্তি যে বান্দা তার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি, অর্থনীতি, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি কোনো ক্ষেত্রে আর কারো আধিপত্য, হুকুম মানবে না। যদি মানে তাহলে সেটা হবে শেরক, অংশীবাদ। আর যদি আল্লাহর হুকুম সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সেটা হবে কুফর (প্রত্যাখ্যান)।

আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলী যেমন তিনি সৃষ্টিকর্তা, রেজেকদাতা, উপাস্য ইত্যাদি সব স্বীকার করেও যদি তাঁর হুকুম না মানে, অর্থাৎ তাঁকে ইলাহ বলে না মানে তাহলে যত আমল করুক সব ব্যর্থ হবে। সে জান্নাতে যেতে পারবে না। এজন্য ইসলামের সমস্ত বিষয়টিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। ঈমান ও আমল। যে ঈমান আনল তার জন্য আমল। এই ঈমান কিসের উপর? আল্লাহর অস্তিত্বে নয় কেবল, আল্লাহর হুকুমের উপর, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর ঈমান। এটা যে আনবে তার জন্য নামাজ, রোজা, হজ্বসহ অন্যান্য আমল প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, তওহীদের বেলায় আল্লাহ এত উদার কেন আর শেরক-কুফরের বেলায় এত কঠোর কেন? তওহীদে থাকলে কোনো গোনাহ আল্লাহ দেখবেন না, সব মাফ করে দেবেন। আর তওহীদে না থাকলে, শেরক করলে কোনো আমলই আল্লাহ দেখবেন না, সবসুদ্ধ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

এখানে আল্লাহ এত কঠোর কেন?

এর উত্তর হচ্ছে, ইবলিসের সাথে আল্লাহর চ্যালেঞ্জ হয়েছিল এই বিষয়টি নিয়ে। আদম সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাঁর সব মালায়েকদের ডেকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন যে, তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করতে চান যার ভিতরে আল্লাহর সব গুণ থাকবে, সে হবে আল্লাহর প্রতিনিধি। এ কথা শুনে মালায়েকরা এর পরিণাম কী হতে পারে সে বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করলেন। তারা বললেন, আপনার এই সৃষ্টি তো পৃথিবীতে গিয়ে ফাসাদ (অন্যায়, অবিচার) ও সাফাকুদ্দিমা (রক্তপাত, যুদ্ধ) করবে। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

তিনি নিজ হাত দিয়ে আদমকে বানালেন এবং তাঁর ভিতরে নিজের রূহ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। মানুষ আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হলো। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করার বিবেক নামক আদালত তার মধ্যে স্থাপিত হলো। এটা আর কারো মধ্যে নেই। আল্লাহ সমস্ত মালায়েককে আদেশ করলেন, তোমরা এর প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত হও। তারা সেজদা করে আদমের সেবায় আত্মনিয়োগ করল। এ কারণেই শক্তিশালী জীবজন্তু থেকে মহাশক্তিশালী বিদ্যুৎকে পর্যন্ত আমরা চাকরের মত ব্যবহার করি, আগুনের মত দৈত্যকে ছোট দেশলাইয়ের বাক্সে পুরে রাখি।

কিন্তু ইবলিস সেদিন সেজদা করে নি। সে আল্লাহর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল এই বলে যে, মানুষ আল্লাহর হুকুম মানবে না। পরিণামে সে অশান্তিতে (ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমায়) পতিত হবে। মানুষ অশান্তিতে পতিত হলেই ইবলিসের জয় এবং আল্লাহর পরাজয়। আল্লাহ মানুষের বিবেকের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ইবলিসকে দাঁড় করালেন তার প্রতিপক্ষরূপে। মানুষের দায়িত্ব

(এবাদত) হলো পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এটা করার পক্ষে বাধা দেবে ইবলিস, সে তা-ই করবে যার পরিণামে মানবসমাজে বিশৃঙ্খলা হয়। মানুষ যদি শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে তাহলে সে পরকালে আবার জান্নাতে ফিরে যাবে। আর যদি না পারে তাহলে ইবলিসের সঙ্গে জাহান্নামে দগ্ধ হবে।

সিরাতুল মুস্তাকীম, সহজ-সরল পথ হচ্ছে প্রকৃত তওহীদ, জীবনের কোন বিভাগে, কোন অঙ্গনে এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানি না এবং কারো এবাদত করি না- এই সহজ সরল কথা।

আল্লাহ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপায় বাতলে দিলেন। সেটাই হচ্ছে এই তওহীদ, যাকে আল্লাহ সেরাতুল মুস্তাকিম বা সহজ-সরল পথ বলে অভিহিত করেছেন। এই পথের গন্তব্যটা হচ্ছে জান্নাত। পথে ইবলিস বসে থাকবে, সে চেষ্টা করবে মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করতে আর মানুষ কোনো অবস্থাতেই এই পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। হলেই সে অশান্তিতে পড়বে, ফলে ইবলিস বিজয়ী হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পরাজিত হবেন। এখন মানুষ কোনটা করবে সেটাই হচ্ছে তার জীবনকালের পরীক্ষা।

আল্লাহ কোর'আনে বার বার বলেছেন- আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। তিনি মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি দিলেন সেটার সার্বভৌমত্ব হলো আল্লাহর। বৃহত্তর ও সমষ্টিগত জীবনে গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার ও গ্রহণ করে নিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের সার্বভৌমত্বটুকু আমরা আল্লাহর জন্য রেখেছি। সেই জাল্লে-জালাল, আযিজুল জব্বার, স্রষ্টা ভিক্ষুক নন যে তিনি এই ক্ষুদ্র তওহীদ গ্রহণ করবেন। তাছাড়া ওটা তওহীদই নয়, ওটা শেরক ও কুফর। রাজতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাজার, বাদশাহ্‌র; ফ্যাসিবাদের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে ডিক্টেটরের অর্থাৎ একনায়কের; সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির ডিকটেটরশিপ; আর এই দীনুল ইসলামের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে - স্বয়ং আল্লাহর, এতে কোথাও কোনো আপসের স্থান নেই। এ কথা যার ঈমান নয়, সে মুসলিমও নয়, মো'মেনও নয় উম্মতে মোহাম্মদী তো দূরের কথা। তারা সারা বছর রোযা রাখলেও, সারারাত্রি নামাজ পড়লেও নয়। এই তওহীদই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিম- সহজ, সরল সোজা পথ।

মরুভূমির বালির ওপর সোজা একটি লাইন টেনে বিশ্বনবী (দ.) বললেন- এই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিম, তারপর সেই লাইন থেকে ডাইনে, বামে আড়াআড়ি কতগুলো লাইন টেনে বললেন- শয়তান এমনি করে মানুষকে এই সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করতে ডাকবে। এই বলে তিনি কোর'আন থেকে পড়লেন- (আল্লাহ বলেছেন) "নিশ্চয়ই এই হচ্ছে আমার সিরাতুল মুস্তাকিম। কাজেই এই পথে চলো, অন্য পথ অনুসরণ করো না; (করলে) তা তোমাদের তার এই মহান পথ থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে (সুরা আন'আম ১৫৩)।

ঐ সিরাতুল মুস্তাকিম, সহজ-সরল পথ হচ্ছে প্রকৃত তওহীদ, জীবনের কোন বিভাগে, কোন অঙ্গনে এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানি না এবং কারো এবাদত করি না- এই সহজ সরল কথা। আমরা এই সিরাতুল মুস্তাকিমে গত কয়েকশ' বছর থেকেই নেই। আমরা যে দীনকে আঁকড়ে ধরে আছি, যেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেনে চলতে চেষ্টা করছি সেটা বহু মাযহাবে, ফেরকায় বিচ্ছিন্ন একটি অতি জটিল পথ, সেটা আর যাই হোক আল্লাহর দেয়া সিরাতুল মুস্তাকিম, সহজ সরল পথ নয়। সিরাতুল মুস্তাকিমের সহজ-সরল লাইন থেকে যে আড়াআড়ি লাইনগুলো মহানবী (দ.) টেনে ছিলেন এবং বলেছিলেন এগুলো শয়তানের লাইন, আমরা বিভিন্ন মাযহাব, ফেরকার ও তরিকার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লোকেরা সেই লাইনগুলোতে আছি।

পৃথিবীতে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহ জয়ী হবেন একমাত্র তওহীদ দিয়ে। বাকি সব আমল দিয়ে আল্লাহ বিজয়ী হবেন না। প্রমাণ বর্তমান বিশ্ব। আমলে ভরপুর, কিন্তু আল্লাহর হুকুম কোথাও নেই। চলছে বস্তুবাদী দাজ্জালের হুকুম। পরিণামে যুদ্ধ, রক্তপাত, হানাহানি, অন্যায়, অবিচার, অশান্তি।

এই প্রসঙ্গ কেন আসল?

সমগ্র বিশ্ববাসী আজ এই অশান্তি থেকে মুক্তির জন্য কঠোর থেকে কঠোরতর আইন বানাচ্ছে, নতুন নতুন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তৈরি করছে কিন্তু শান্তি আসছে না। মুসলিমরা প্রচুর আমল করছে, রোজা রাখছে, নামাজ পড়ছে, উপরন্তু খতম তারাবিও পড়ছে কিন্তু তাদের দুর্দশা কাটছে না। তাদের দেশগুলো আজ সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের কবলে। পরকালেও তারা জাহান্নামে যাবে কারণ তারা তওহীদে নেই। এই পরিণতি থেকে মুক্তির একটাই উপায় যেটা আল্লাহর রসুল আরববাসীর সামনে তথা মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। সেটা হচ্ছে তওহীদের চুক্তিতে ফিরে আসা। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং সকল ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এতে করে তারা দুই দিকে লাভবান হবে; প্রথমত তারা দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব পাবে, পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে ভাই ভাই হতে পারবে, তাদের সমাজ শান্তিময় হবে। দ্বিতীয়ত তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করাবেন।

আল্লাহর হুকুম মানার দু'টি যুক্তি

মো: আলী হোসেন

যুক্তি এক:

বাবা-মা সন্তানকে এমনভাবে ভালোবাসে যা পরিমাপ করার মতো কোনো যন্ত্র পৃথিবীতে নেই। তাদের স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়া সবকিছুতেই মিশে থাকে সন্তানের চিন্তা। নিজের খাবার না জুটলেও সন্তানকে না খাইয়ে রাখেন না। সন্তানের খাবার, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ সবকিছুর যোগান দেন তার বাবা-মা। সন্তানদের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তারা। অসুস্থ সন্তানের পাশে সারা রাত জেগে থেকে তার সেবা-সুশ্রুষা করেন, একটু জেগে উঠে সন্তান যদি একবার বাবা বলে ডাক দেন তাহলে বাবা দশবার সাড়া দেন, বলেন কী হয়েছে বাবা, কী লাগবে তোমার? এই সন্তান যদি বাবা-মায়ের হুকুম (আদেশ-নিষেধ) না শুনে তার বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড় শত্রুর হুকুম মেনে চলে তবে সেটা কেমন হবে? নৈতিকভাবে সেটা কি উচিত হবে?

আমাদের বাবা-মা আমাদেরকে যেমন ভালোবাসেন তার চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসেন আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ, তিনি আমাদেরকে পরম মমতায় নিজ হাতে বানিয়েছেন, আমাদের বসবাসের উপযোগী করে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য, বাসস্থানসহ সমস্ত কিছু মূলত দিচ্ছেন তিনিই। আমাদেরকে জান্নাত দিবেন আল্লাহ, আমাদের সমস্ত ন্যায্য চাওয়া পূরণ করেন আল্লাহ। আমরা যদি আল্লাহকে একবার ডাকি তিনি শতবার সাড়া দেন, তিনি বলেন- হে আমার প্রিয় সৃষ্টি, আমার খলিফা, বলো- তুমি কী চাও? তাহলে যুক্তিসঙ্গতভাবেই কি তাঁর হুকুম (আদেশ-নিষেধ) মান্য করা আমাদের উচিত নয়? আমরা যদি তাঁর হুকুম মানার পরিবর্তে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ইবলিসের হুকুম মান্য করি তবে সেটা কেমন হবে?

যুক্তি দুই:

আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ চান তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষ যেন অন্যায়, অবিচার, অশান্তির মধ্যে পতিত না হয়। তারা যেন সুখ-শান্তির মধ্যে বসবাস করতে পারে। মানুষের জন্যই তিনি এই পৃথিবীকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত করেছেন আর নিয়ামত স্বরূপ দিয়েছেন আলো, পানি, বাতাস, বৃক্ষরাজি, তরুলতা, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, নদী, পশু-পাখি, ফুল-ফল, শস্য ইত্যাদি। মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু দেওয়ার পর এই পৃথিবীকে ন্যায়, সুবিচার, শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ পাক এই মানুষকেই দিলেন। মানুষকে আল্লাহ বানালেন তাঁর প্রতিনিধি, খলিফা। (সুরা বাকারা-৩০)। কিন্তু এই পৃথিবী পরিচালিত হবে কীভাবে? কোন্ নীতি অনুসরণ করে চললে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি সৃষ্টি হবে না? পৃথিবী পরিচালনার বিধান কী হবে? মানবসমাজ পরিচালনার বিধান কি মানুষ নিজেই তৈরি করে নেবে, নাকি আল্লাহ পাক এই পৃথিবী পরিচালনার জন্য মানুষকে একটি নিখুঁত বিধান দিবেন? এ কথা সকল যুক্তির ঊর্ধ্বে যে, কোনো জিনিসের স্রষ্টাই ঐ জিনিসের ন্যায়সঙ্গত বিধাতা। কারণ যিনি সেটা সৃষ্টি করেছেন তার চেয়ে ঐ জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহার, পরিচালনা-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের পক্ষে একইসাথে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়; নারী, পুরুষ, শিশু, ধনী, গরিব, ফর্সা, কালো, লম্বা, বেটে, ইউরোপীয়, আমেরিকান, এশীয়, আফ্রিকান একসাথে সমস্ত মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া মানুষ যখন বিধান তৈরি করবে তখন নিজের এবং নিজের গোষ্ঠী, পরিবার, জাতি ইত্যাদি স্বার্থ মাথায় রেখে বিধান তৈরি করবে। কাজেই মানুষের পক্ষে এমন হুকুম, বিধান তৈরি করা সম্ভব নয় যা একদিকে নিখুঁত হবে অন্য দিকে সকলের জন্য উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত হবে। এ কারণেই মহান আল্লাহ একটি জীবনবিধান পাঠিয়েছেন যা সমস্ত মানবজাতির জন্য, সর্বকালের জন্য উপযুক্ত, নিখুঁত এবং ন্যায়সঙ্গত। আল্লাহর প্রদত্ত এই জীবনব্যবস্থারই নাম হচ্ছে দীনুল হক বা সত্যদীন অর্থাৎ ইসলাম। ইসলামের সর্বশেষ সংস্করণ আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল মোহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে। আল্লাহ তাঁকে এই দীনটি সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁকে এই দায়িত্ব অর্পণের পর ধারণাগতভাবে এই পৃথিবীতে প্রচলিত সকল জীবনব্যবস্থা, বিধি-বিধান মানবজাতির ন্যায়সঙ্গত বিধাতা আল্লাহ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত (Banned) ঘোষিত হয় এবং রসুলাল্লাহ হয়ে গেলেন পৃথিবীতে তখন আল্লাহ'র পক্ষ থেকে একমাত্র বৈধ কর্তৃপক্ষ।

যখনই মানুষ আল্লাহর হুকুম-বিধান প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের মনমতো চলবে, নিজেদের তৈরি করা হুকুম-বিধান দিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তখনই অন্যায়-অবিচার-অশান্তি সৃষ্টি হবে। যেমন আজ পৃথিবীব্যাপী হচ্ছে। তাহলে আপনার সামনে যদি দু'টি হুকুম থাকে যার মধ্যে একটি মান্য করলে শান্তি আর অন্যটি মান্য করলে অশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে তবে যুক্তিসঙ্গতভাবে আপনি কোনটা মানবেন?

এখানে দু'টি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করলাম, এ ছাড়াও বহু যুক্তি মহান আল্লাহ দিয়েছেন তাঁকে হুকুমদাতা হিসাবে মানার জন্য। এত অকাট্য যুক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষ আল্লাহর হুকুম অমান্য করে ইবলিসের হুকুম মানতে থাকে তবে সমগ্র পৃথিবী অশান্তির অগ্নিগোলকে পরিণত হবে এবং এক সময় সমগ্র মানবজাতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে। তাই আল্লাহ মানুষকে তাঁর হুকুমের উপর নিয়ে আসার জন্য যুগে যুগে নবী-রসুল, পথ-প্রদর্শক পাঠিয়েছেন। এতদাসত্ত্বেও যারা আল্লাহর হুকুম না মেনে ইবলিসের হুকুম মানতে থাকবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

লেখক: সভাপতি, হেযবুত তওহীদ, ঢাকা মহানগরী

প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশে আমার কিছু কথা

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, এমাম, হেযবুত তওহীদ

আবহমান বাংলার ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এখানকার আপামর মানুষ দীর্ঘ শত-সহস্র বছর ধরে একত্রে বসবাস করে এসেছে। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামল এই বাংলার মাটিতে তারা জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পাশাপাশি সহাবস্থান করেছে, একে অপরের সুখ-দুঃখ, হাসি-বেদনা, আচার-অনুষ্ঠানাদি ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এখানকার হিন্দু-মুসলমান এক গাছের ছায়ায় ঘুমিয়েছে, এক গাছের ফল খেয়ে পুষ্ট হয়েছে। একতারা, দোতারার সুরে তারা সকলেই আপ্লুত হয়েছে। একসাথে দুর্যোগ-দুর্বিপাক মোকাবেলা করেছে, পান্তা-ইলিশ খেয়ে তৃপ্ত হয়েছে। এই সহাবস্থান, এই পারস্পরিক সম্প্রীতি আবহমান বাংলার সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ঐতিহ্যগতভাবেই তারা শান্তিপ্রিয়, অতিথিপরায়ণ। কিন্তু এই বাংলার মানুষকে বহু বিদেশি শক্তি দ্বারা পদদলিত হতে হয়েছে। বলা যায়, প্রাচুর্যে পূর্ণ এদেশের মানুষের অতিথিপরায়ণতার সুযোগ নিয়ে বহু জাতি বেনিয়ার বেশে এদেশে প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তীতে প্রভুর আসনে আসীন হয়েছে। ফলে বারবার এই ভূ-খণ্ডের স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এদেশের ইতিহাস আমরা যতটুকু জানি, ১৫৭৬ সালে টাঙ্গাইলের পন্নী বা কররানি পরিবারের সুলতান দাউদ খান পন্নী জীবন দিয়েছিলেন বহিঃশক্তির হামলা থেকে এদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে। মূলত দাউদ খান পন্নীর পরাজয় ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। পরবর্তীতে বাংলার শাসক হিসেবে যে নবাবদের নাম আমরা পাই বাস্তবে তারা কেউ স্বাধীন ছিলেন না। অবশেষে পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা এদেশের শাসনব্যবস্থায় প্রবেশ করে। দীর্ঘ দুইশ' বছরের অবর্ণনীয় শোষণের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে তারা যখন উপমহাদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে চলে যায়, তখনো বাঙালির মুক্তি মেলেনি। সে ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। এভাবে যখনই এ দেশের মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে, নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, বহিঃশক্তির শোষণের শিকার হয়েছে, তখনই বহু মনীষী, বিপ্লবী আর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মানুষকে তাদের অধিকার ফিরে পাওয়ার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে, বিক্ষুব্ধ হয়েছে, সংগ্রাম করেছে, জীবন দিয়েছে। এমন হতে হতে ১৯৭১ সালে দীর্ঘ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে বাংলার মাটি ও জনগণ মুক্তি পায়। সেই থেকে আজ অবধি আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ১৯৭১ সালে অর্জিত এই স্বাধীনতা এ দেশের মানুষের জন্য একটি বিরাট মাইলফলক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একটা সহজ সত্য এই যে, শত শত বছর ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে থাকার কারণে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, স্বাধীন জাতির মন-মানসিকা, নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বতন্ত্র পরিকল্পনা আমরা হারিয়ে ফেলি। সেই মন-মানসিক কিন্তু আজ পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরেজরা যে পথ আমাদের দেখিয়ে গেছে আজ অবধি আমরা সেই পথেই হাটছি। স্বাধীনতার পর থেকে শুরু হয়েছে দেশটা কিভাবে চলবে তা নিয়ে মতভেদ। শাসন ব্যবস্থা কেমন হবে, এক দলীয় নাকি বহুদলীয় তা নিয়ে সংঘাত। সংস্কৃতিটা কেমন হবে? আরবীয় নাকি ভারতীয়? পরিচয়টা কী হবে? বাঙালি নাকি বাংলাদেশি? এ রকম বহু বিষয় নিয়ে মতভেদ চলে আসছে। রাজনৈতিক বিভক্তি, দলাদলি, স্বার্থ নিয়ে কামড়াকামড়ি, রক্তপাত, রাষ্ট্রনায়ক হত্যা, সেনাপ্রধান হত্যা, এসব করতে করতে আমরা এ পর্যন্ত এসেছি। বর্তমানে আমাদের অবস্থা অনেক মৃত্যু উপত্যকার কিনারে দাঁড়িয়ে থাকার মতো। আমাদের বিভক্তি এবং পারস্পরিক ঘৃণা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। জাতি বৃহৎ কোনো সংকটে পড়লে তাকে মোকাবেলা করার কতটুকু সামর্থ্যও আমাদের আছে তা বিচারের ভার সাধারণ জনগণের উপরই ছেড়ে দিলাম। এরই মধ্যে কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতাব্দী আমরা পার করে এসেছি। এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর আজকে

আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে নিয়ে নতুন করে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছি।

আমাদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির পাশাপাশি বিশ্ব পরিস্থিতির কথাও বিবেচনা করতে হবে। আজকের বিশ্বকে বলা হয় গ্লোবাল ভিলেজ; অর্থাৎ পুরো পৃথিবীই একটি গ্রামের মতো। একটা গ্রামের কোথাও ডাকাত ঢুকলে যেমন মুহূর্তের মধ্যে এর খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে, এক চিৎকারে সারা গ্রামের মানুষ বেরিয়ে আসে, বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতিটাও অনেকটা এরকম। রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ বহুভাবে সারা পৃথিবী এখন কানেক্টেড, একে অপরের সাথে যুক্ত। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, জাতিতে জাতিতে অসংখ্য, চুক্তি, সন্ধি এবং সমঝোতা ইত্যাদি হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত হয়েছে। তো এখন যে পরিস্থিতি, বিশ্বের যে টাল-মাটাল অবস্থা তাতে বাংলাদেশও গভীরভাবে যুক্ত। জঙ্গিবাদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে আগুন জ্বলছে। আফগানিস্তান মাটির সাথে মিশে গেল, সিরিয়া আজকে ২ পরাশক্তির যুদ্ধের রণক্ষেত্র, ইরাক গণকবর হলো, লিবিয়া ধ্বংস হলো। একের পর এক মুসলিম দেশকে টার্গেট করা হচ্ছে। এই হুমকি মোকাবেলায় মুসলিম দেশগুলোর মধ্যেও কোনো ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নেই। বরং আমরা দেখে আসছি আরব দেশগুলোই একে অপরের মুখোমুখি। বর্তমানে তো একেবারে যুদ্ধংদেহী অবস্থান। এ অবস্থায় বাংলাদেশের জন্য ভয়ের বিষয় হলো, এখানেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ (শেষ জরিপ হিসেবে ৮৮%) মুসলিম। এখন এই ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ঈমানকে, ধর্মবিশ্বাসকে বহুভাবে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে এ পর্যন্ত অনেক ঘটন অঘটন ঘটানো হয়েছে। কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে আর কেউ রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করেছে। কেউ আবার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করছেন। যে কারণে এখন অর্থনীতিবীদরা বলেন বাংলাদেশে ধর্মের নামে অর্থনীতি শক্তিশালী অবস্থা। ২০% ইকোনমি। অন্য দিকে চরমপন্থা অবলম্বনকারী গোষ্ঠীগুলোও ধর্মকে ব্যবহার করে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। সাম্প্রতিক অতীতে আমরা এমন সব ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি যেগুলো এক সময় আমরা সংবাদপত্রের আন্তর্জাতিক পাতায় পড়ে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু একই ধরনের ঘটনা এখন আমাদের এখানে ঘটছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এখন এই ধর্মীয় ইস্যুটাকে কেন্দ্র করে দুনিয়া যখন টাল-মাটাল তখন বাংলাদেশকেও কানেক্ট করে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অস্তিত্ব, বাংলাদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সমস্ত কিছু ভয়াবহ হুমকির মুখে। এখন এটা নিয়ে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনগণকে ভাবতে হবে। জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করতে গিয়ে বিশ্বের বাঘা বাঘা রাষ্ট্রগুলোও শুধুমাত্র শক্তি ব্যবহার করে ব্যর্থ হয়েছে। এখন সবাই বলছেন, একে মোকাবেলা করতে হলে অবশ্যই আদর্শ লাগবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ না থাকে, তারা যদি স্বার্থ নিয়ে সংঘাতে লিপ্ত থাকে, জাতির অস্তিত্বের সংকটেও নির্বিকার স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন করে, তাহলে জঙ্গিবাদের মতো বৃহৎ সংকটকে মোকাবেলা করা কি আদৌ সম্ভব? সরকারগুলো শুধু শক্তির জোরে এই পর্যন্ত মোকাবেলা করে এসেছে। কিন্তু এভাবে কতদিন তারা চালিয়ে যেতে পারবে? ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, আফগানিস্তান আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কথা হচ্ছিল বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে। ব্রিটিশদের শিখিয়ে দিয়ে যাওয়া এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার গোড়াতেই রয়েছে এক দলের বিরুদ্ধে আরেকদলের ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার আর বিষোদগার, কর্মীদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ যাবতীয় বেআইনী কর্মকাণ্ড। এই রাজনৈতিক সিস্টেমে অর্থ আর পেশীশক্তিই সব কিছু, এখানে আদর্শের কোনো জায়গা নেই। মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে যে যা পারছে করছে, কারো কাছে কোনো আদর্শ নেই। রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে মিলিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে একদল ক্ষমতায় যাচ্ছে, পরের দিন থেকে অন্য দল বা জোটগুলো ক্ষমতাসীনদের গদি থেকে নামানোর জন্য জ্বালাও-পোড়াও হরতাল ভাঙচুর করছে। বলা হচ্ছে এগুলো করা তাদের 'গণতান্ত্রিক অধিকার'। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন সরকার আবার জনগণের জান-মাল হেফাজতের কথা বলে, নিরাপত্তার কথা বলে, স্থিতিশীলতার কথা বলে ভয়ানক দমন পীড়ন শুরু করে। এভাবে এই গণতন্ত্রের বলির পাঠা হচ্ছে দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ আর শত শত মানুষের জীবন। আর শত্রুতা, পারস্পরিক আস্থাহীনতা যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে তাও বলার বাকি রাখে না। এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এক সময় ছিল রাজধানীভিত্তিক। এখন তা গ্রামের পাড়া, মহল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দক্ষিণপাড়া উত্তরপাড়া এখন মুখোমুখি। সামান্য ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় ভয়ানক ঘটনা। একেকটা নির্বাচন মানে একেকটা লাশের সারি। দা, চাপাতি, বল্লম নিয়ে এক পক্ষ আরেক পক্ষের উপর হামলা করে; কখনো বিরোধী দলের উপর, কখনো নিজ দলেরই প্রতিপক্ষের উপর। প্রত্যেক নির্বাচনের আগে সীমান্ত দিয়ে দেশে অস্ত্র প্রবেশ বেড়ে যায়। স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত এই 'গণতান্ত্রিক সন্ত্রাস' দেশ ও জনগণের কি পরিমাণ জান-মাল নষ্ট করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

অর্ধ শতাব্দী হতে চললো আমরা এগুলো করে এসেছি। আর কত? আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে যেখানে সবচেয়ে জরুরি হলো কেন্দ্রীভূত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, বিভেদের দেয়াল চুরমার করণ, সেখানে এই বিভাজনের রাজনীতি আমরা আর কতদিন জিঁইয়ে রাখব সেটাই বড় প্রশ্ন। এখানে বিশ্বপরাশক্তিগুলো ইতোমধ্যে দুনিয়া দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কোনো একটি ইস্যু পেলেই বিশেষ করে মুসলিমপ্রধান ভূ-

খণ্ডগুলোতে হামলা চালানোর জন্য তারা মুখিয়ে আছে। পাশাপাশি আছে আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিগুলো। এমতাবস্থায় জাতিসত্ত্বা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে সমস্ত বিভক্তির পথ বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এখানে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র বা ধর্মতন্ত্র বড় কথা নয়। তন্ত্র-মন্ত্রের প্রসঙ্গটা এখানে পরে। কি করলে সমাজের মানুষগুলো ঐক্য হবে, তাদের মধ্যকার বিভক্তি-হানাহানি দূর হবে সেই পথ খুঁজতে হবে। নিজেদের মধ্যে দলাদলি করে আমরা বিদেশি পরাশক্তিদের কাছে একে অন্যে বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে যাচ্ছি, তাদের কাছে সমাধান চাচ্ছি, তাদের কূটনীতিকদের নিয়ে মিটিং করে একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের ফর্দ তুলে ধরছি। তারা আমাদেরকে আমন্ত্রণ দেয়, সাহায্য দেয়, আবার এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তাদের কাছে আমরা আশ্রয়ও পাই। কেন? নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরা করতে পারি না? আমাদের বুঝতে হবে, তারা যে রাজনীতি আমাদের শিখিয়েছে তা চিরদিন আমাদেরকে তাদের নতজানু করে রাখবে। আমরা দলাদলি করে বিভক্ত হয়ে থাকব, নিজেরা মারামারি করে শেষ হয়ে যাব, তারা মাঝেমধ্যে এসে শাসন করে যাবে, এভাবে চলতে থাকবে। আর কখনো কেউ তাদেরকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করতে না চাইলে তারা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ গড়তে মদদ দেবে, অস্ত্র, অর্থ সরবরাহ করবে। প্রয়োজনে সেখানে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়ায় ঠিক এটাই করা হয়েছে। আজকের সিরিয়া কিন্তু প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদেরও না, সিরিয়ার জনগণেরও না। সিরিয়ার মানুষ যদি বলে এদেশ আমাদের সেটা ভুল হবে। সিরিয়া এখন পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর। সিরিয়ায় কি ঘটবে, সিরিয়া আর কতদিন টিকে থাকবে, সিরিয়া একটা দেশ থাকবে নাকি ভেঙে টুকরো টুকরো হবে, সেখানে মানুষগুলো সুখে থাকবে নাকি তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে, সামরিক গ্যারিসন বানানো হবে, এসবই কিন্তু পরাশক্তিগুলোর করুণার উপর নির্ভর করছে। দেশগুলো কিন্তু একেবারে আমাদের চোখের সামনে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তাদের দুর্বলতাগুলো আসলে কোথায় ছিল তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এই বিভাজনের নীতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বৃহৎ সংস্কার নিয়ে আসতে হবে। হীনম্মন্যতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের কৌশল নিজেদেরই ঠিক করতে হবে। আমাদের মনে রাখা উচিত, সারা বিশ্বকে শোষণ করে নিয়ে সম্পদের প্রাচুর্যের উপর বসে তারা যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে চলছে তা দিয়ে আমরা চলতে পারি না। এভাবে চলতে থাকলে অনাদিকাল পর্যন্ত আমাদেরকে তাদের গোলামি করে যেতে হবে কিংবা কোনো এক সময় তাদের আগ্রাসনের শিকার হতে হবে।

জাতিটাকে একেবারে গোঁড়াতেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে দু'টি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। একদিকে কিছু মানুষ মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামের সঠিক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী একটি আদর্শ নিয়ে বড় হচ্ছে, আরেকটি দিকে বাকিরা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষাহীন সম্পূর্ণ ভোগবাদী একটি আদর্শ নিয়ে বেড়ে উঠছে। সেখানে মাদরাসার মধ্যে আবার দুই ভাগ। একটা হলো শত শত বছরের প্রাচীন কওমী ধারা আর একটা হলো ব্রিটিশদের তৈরি করা আলিয়া। সাধারণ শিক্ষায়ও আবার দুই ভাগ- ইংলিশ মিডিয়াম, বাংলা মিডিয়াম।

আর দ্বিতীয় বৃহৎ সংস্কারটি করতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। এ পর্যন্ত আমাদের নিজস্ব কোনো শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই আমরা এখনো ধুঁকে ধুঁকে চলছি। এখানে শিক্ষাব্যস্থার মূল ধারা দু'টি- মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষা। জাতিটাকে একেবারে গোঁড়াতেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে দু'টি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। একদিকে কিছু মানুষ মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামের সঠিক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী একটি আদর্শ নিয়ে বড় হচ্ছে, আরেকটি দিকে বাকিরা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষাহীন সম্পূর্ণ ভোগবাদী একটি আদর্শ নিয়ে বেড়ে উঠছে। সেখানে মাদরাসার মধ্যে আবার দুই ভাগ। একটা হলো শত শত বছরের প্রাচীন কওমী ধারা আর একটা হলো ব্রিটিশদের তৈরি করা আলিয়া। সাধারণ শিক্ষায়ও আবার দুই ভাগ- ইংলিশ মিডিয়াম, বাংলা মিডিয়াম। ইংলিশ মিডিয়ামের সমস্ত সিলেবাস, কারিকুলাম সব ইংরেজিতে। শেক্সপিয়ার, বায়রন, কীটসদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা পড়ে তারা বড় হচ্ছে। মধ্যযুগের পরিপন্থিতে জন্ম নেওয়া রেনেঁসার ভিত্তিতে তারা যে সাহিত্য রচনা করে গেছেন তাদেরকে সেগুলো পড়ানো হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবচেতনভাবেই একটি মানসিকতা গড়ে উঠছে, আমাদের দেশের চিন্তা-চেতনা থেকে ব্রিটিশরা ভালো, ফ্রান্স ভালো, জার্মানি ভালো। পশ্চিমাদের প্রতি প্রচণ্ড হীনম্মনতা সৃষ্টির কৌশল চালু করে রাখা হয়েছে। আবার রয়েছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আর পাবলিক ইউনিভার্সিটি। এখানে আবার চলে বিরাট শিক্ষাবাণিজ্য। একটা বিশেষ শ্রেণি আবার শিক্ষিত হওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়ে বিদেশেও যাচ্ছে। এভাবে শিক্ষব্যবস্থাকে বহুভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের সামনে উত্তম কোনো আদর্শ তুলে ধরা হচ্ছে না। এর শেষ ফলাফল হচ্ছে একটা গোষ্ঠী

বের হয়ে আসছে চূড়ান্ত স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে, আরেকটি গোষ্ঠী বের হচ্ছে ধর্মকে বিক্রি করে রুটি-রুজি করতে। একদল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুরি মারামারি করছে, টেন্ডারবাজি নিয়ে খুনোখুনি করছে। আরেকদল ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে হুজুগে মাতিয়ে তুলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করছে, জঙ্গিবাদে জড়াচ্ছে। তারা না শিখছে দেশপ্রেম, না পাচ্ছে ধর্মের সঠিক শিক্ষা, না শিখছে নীতি-নৈতিকতা কিংবা মানবতা। যে যত শিক্ষিত হয়ে যত বড় পদে যাচ্ছে সে দেশ ও জনগণের সম্পদ তত বেশি লুট করছে, খাবারে-ওষুধে বিশ মেশাচ্ছে। আত্মিক শিক্ষাহীন এই কথিত শিক্ষিত শ্রেণিটি জাতির সম্পদ গ্রাস করে নিজেদের সমৃদ্ধ করছে। এখানে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স নষ্ট হয়ে গেলে তা ঠিক করার ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই, অথচ নিজে অসুস্থ হলে বিমান খরচ করে যাবে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথে থেকে চিকিৎসা করিয়ে আসছে। অথচ ওই বিমানের ভাড়া দিয়ে ১০০টি অ্যাম্বুলেন্স কেনা যায়।

আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে নিজেদের অস্তিত্ব লড়াইয়ের সংগ্রামে আমাদের গোড়া থেকে ভাবতে হবে। কোথায় আমরা পথ হারিয়েছি সেটা আগে উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের মনে রাখা উচিত, আমাদের বড় বড় মারণাস্ত্র নেই, আমরা পারমাণবিক শক্তির দাপটে কথা বলব সেই সুযোগ নেই। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে তাদের সাথে কম্পিটিশনে নামব সেই সামর্থও আমাদের নেই। আমাদের দেশের সব মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া, সবাইকে শিক্ষিত করে তোলা, নিজস্ব অর্থায়নে একটি পদ্মা সেতু নির্মাণ- এগুলোই এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে স্বপের মতো বিষয়। সুতরাং টাল-মাটাল বিশ্ব পরিস্থিতিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখা এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই স্বতন্ত্র পরিকল্পনা থাকতে হবে। যে বিভাজনের নীতি দিয়ে দেশ এতদিন চলে আসছে তা পরিবর্তন করতেই হবে। বিকল্প পথ খুঁজতেই হবে। আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, সেই বিকল্প, সেই সম্ভাবনা আমাদের কাছে আছে। একটি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে, একটি সম্ভাবনাহীন জাতিকে বিশ্ব নেতৃত্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে শক্তিশালী আদর্শ প্রয়োজন সেটা হেযবুত তওহীদের কাছে রয়েছে। ধীরে ধীরে আমরা তা মানুষের সামনে তুলে ধরছি।

এ দেশের সাধারণ জনতার উদ্দেশে কিছু কথা বলে লেখাটি শেষ করব। আজকের এই রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে জনগণ কি করবে? তারা প্রচলিত এই সিস্টেমে আর কতদিন পদদলিত হবে? কত আর জনগণ পয়সা খেয়ে মার্কার পিছনে দৌড়াবে, চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের ভয়ে তটস্থ থাকবে? জনগণ আর কত মোল্লাকে টাকা দিয়ে জান্নাত কিনবে? জনগণ আর কত বিদেশিদের দিকে হা করে চেয়ে থাকবে? জনগণ আর কত বোমা খেয়ে মরবে? জনগণ আর কত হরতাল অবরোধের কবলে পড়ে জান-মাল হারাবে? চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হতে দেখেও নীরবে সহ্য করে যাবে? দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র দেখেও আর কতদিন ভাগ্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেবে? এই অচলায়তন ভাঙার সময় কি এখনো হয় নি? এদেশের প্রতিটি মানুষকে জেগে উঠতে হবে, নতুন রেনেসাঁর জন্ম দিতে হবে। ধর্মের নামে যত অধর্ম আর রাজনীতির নামে অপরাজনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, এক ইস্পাতকঠিন দেয়াল নির্মাণ করতে হবে। এই সাংঘাতিক নবজাগরণের প্রয়োজনে আত্মকেন্দ্রিকতা আর স্বার্থপরতার বেড়াজাল থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসতে হবে। যদি আমরা তা করতে পারি তবে নিশ্চিত করে বলব, আমাদের দেশ-মাটিও রক্ষা পাবে, আমাদের ধর্মও টিকবে, ইজ্জতও টিকবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সুরক্ষিত হবে। আর যদি তা করতে না পারি তাহলেও আরেকটি কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি, আজ হোক কাল হোক, আমাদেরকেও ইরাক-সিরিয়ার ভাগ্য বরণ করতে হবে। এই কথাটুকু বলার জন্য পীর ফকির হওয়ারও প্রয়োজন নেই, নবী-রসুল হওয়ারও প্রয়োজন নেই, এটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিণতি, আমাদের কর্মফল। এত ধর্মান্ধতা, এত বিভক্তিকরণ, এত ধান্দাবাজি, দুর্নীতি, এত অপরাজনীতি, এত স্বার্থপরতা জিঁইয়ে রেখে কোনো জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে আমাদের ধ্বংস কেবল সময়ের ব্যাপার। আমাদের সেই শত বছরের সীমানা বেষ্টনির মধ্যে ধাঁই ধাঁই করে জনসংখ্যা বাড়ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার থাকা, খাওয়াই এখানে মহাচিন্তার বিষয়। এই বিরাট জনগোষ্ঠীর সামনে সামগ্রিক কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো আদর্শ নেই। এখানে তরুণ ক্রিকেট উন্মাদনায় অস্থির হয়ে থাকে, মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। রাষ্ট্র, দেশ, বিশ্ব কোন্ দিকে যাচ্ছে, তরুণ প্রজন্মকে কে কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। যে যেভাবে পারছে মরা গরুর মতো জাতিকে খুবলে খাচ্ছে। কেউ দিনের বেলায় খাচ্ছে, কেউ রাতের বেলায় খাচ্ছে। লাল পাসপোর্ট রেডি করে রাখছে, বিদেশে সেকেন্ড হোম বানিয়ে রাখছে। খাওয়া শেষে এখানে থাকা অনিরাপদ মনে করলে, সেকেন্ড হোমে চলে যাচ্ছে, রাজনৈতিক আশ্রয় পাচ্ছে। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের কিন্তু সেকেন্ড হোমও নেই, লাল পাসপোর্টও নেই। লন্ডনে, নিউইয়র্কে, মস্কোতে গিয়ে আশ্রয় পাব সেই সুযোগও নেই। সুতরাং এই দেশকে কোনোভাবেই আমরা সিরিয়া-ইরাক হতে দিতে পারি না। আমাদেরকে বুক পেতে দিয়ে এ মাটিকে রক্ষা করতে হবে। যারা ঈমানদার তাদের উদ্দেশ্যে বলব, রসুল (স.) ও তাঁর সঙ্গীরা যেমন মদিনার মাটিকে রক্ষা করেছিলেন, আমাদেরকেও এই মাটিকে রক্ষার শপথ নিতে হবে। নয়তো আমাদের কোনো ধর্ম পরিচয়ও থাকবে না, জাতি পরিচয়ও থাকবে না। আমাদের সবার তখন একটাই পরিচয় হবে, উদ্বাস্তু।

ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ

রিয়াদুল

ধর্ম এসেছে মানুষের সমাজে ন্যায়-শান্তি-সুবিচার উপহার দেওয়ার জন্য। সেই ধর্ম যখন কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ারে বা জীবিকার মাধ্যমে পরিণত হয় তখন সেই ধর্ম বিকৃত হয়ে যায়। সেটা আর ন্যায়-শান্তি-সুবিচার উপহার দিতে পারে না। অগণিত নবী-রসুল পাঠানোটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহর একটি অপরিবর্তনীয় নীতি হচ্ছে, ধর্মকে ব্যবহার করে পার্থিব স্বার্থ হাসিল (ধর্মব্যবসা) নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যারা এই হারাম কার্যের সাথে জড়িত তারা স্বভাবতই নিজেদের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার ভয়ে এ দলিলগুলো মানুষের কাছে গোপন রাখেন।

আল্লাহর বিধান গোপন করা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ। কুফর শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্য ঢেকে রাখা। সত্য মানুষকে শান্তির পথ, জান্নাতের পথ দেখায়। যারা সে সত্যকে গোপন করে তারা পৃথিবীতে মানুষের শান্তি লাভের অন্তরায় এবং পরকালে জান্নাত লাভের অন্তরায়। এ ঘৃণ্য কাজ যারা করবে তারা যে পৃথিবীতেই জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করছে, তারা যে পথভ্রষ্ট তা আল্লাহ সুরা বাকারার ১৭৪-১৭৫ নম্বর আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন, "বস্তুত, যারা আল্লাহ কেতাবে যা অবতীর্ণ করেছেন তা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে পার্থিব তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ঢুকায় না। এবং আল্লাহ হাশরের দিন তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। এরাই হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষ যারা সঠিক পথের (হেদায়াহ) পরিবর্তে পথ ভ্রষ্টতা (দালালাহ) এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করে নিয়েছে। আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল। সুতরাং আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কেতাবের বিধিবিধান ও শিক্ষাকে গোপন করে এবং দীনের বিনিময়ে অর্থ বা স্বার্থ হাসিল করে- (১) তাদের সকল নেক আমল অর্থহীন। (২) হাশরের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, (৩) তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। (৪) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। (৫) তারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে।

আমরা আলেম সমাজের কাছে কেন যাই, কেন তাদের ওয়াজ, খোতবা নসিহত শ্রবণ করি? নিশ্চয়ই পরকালীন মুক্তির পথ জানার জন্য, হেদায়াতের জন্য? অথচ যে সকল আলেমগণ ধর্মের কাজের বিনিময়ে অর্থ/স্বার্থ গ্রহণ করে তারা নিজেরাই পথচ্যুত। একজন পথচ্যুত মানুষ কী করে অপরকে পথ দেখাবে? এ কারণেই সুরা ইয়াসীনের ২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে কোনোপ্রকার বিনিময় চায় না এবং যারা সঠিক পথে, হেদায়াতে আছে।" এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি বিনিময় গ্রহণকারীর, বিনিময় কামনাকারীর পেছনে উপাসনায় অংশ নেয় তাহলে সে আল্লাহরই নাফরমানি করল।

আল্লাহর দৃষ্টিতে দীন ব্যবসা কত ঘৃণিত তা উপলব্ধি করার জন্য সুরা বাকারার ১৭৪ নম্বর আয়াতের পূর্বের আয়াতটিও পড়া দরকার। সুরা বাকারা ১৭৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন "তিনি তো হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি অনন্যোপায় হয়ে, লোভের বশবর্তী না হয়ে বা সীমালঙ্ঘন না করে তা ভক্ষণ করে তাহলে তার কোনো গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময় (সুরা বাকারা ১৭৩)।

লক্ষ্য করুন, এ আয়াতে আল্লাহ কয়েকটি বস্তু ভক্ষণকে হারাম করলেন, কিন্তু কেউ যদি বাধ্য হয়ে খায় তাহলে তাকে তিনি ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে যেখানে আল্লাহ দীনের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করাকে 'আগুন খাওয়া' বললেন, তার পরে কিন্তু এটা বললেন না যে, অনন্যোপায় হয়ে কেউ খেলে আল্লাহ সে অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কোনো অবস্থাতেই, এমন কি জীবন গেলেও আল্লাহর দীনের কাজের পার্থিব বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না। কেন এই কঠোর নিষেধাজ্ঞা তা পরের আয়াতে (২:১৭৬) ফুটে উঠেছে। আল্লাহ বলেন, "যে কারণে এ শাস্তি তা হলো, আল্লাহ সত্যসহ কেতাব নাজিল করেছেন। এবং যারা এই কেতাবের বিষয়বস্তু নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করে

দ্ধ হওয়ার দলিল

হাসান

তারা চূড়ান্ত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"

মনে রাখতে হবে, আল্লাহর দীন বিকৃত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে মতভেদ সৃষ্টি। এ কাজটি সাধারণ মুসলিমরা করেন না, করেন কথিত ধর্মজ্ঞানীরা। তাদের দীন সংক্রান্ত মতভেদের পরিণামে জাতি আজ হাজারো ফেরকা-মাযহাবে-তরিকায় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে। তারাবির সালাত ৮ রাকাত না ২০ রাকাত, নবী নূরের তৈরি না মাটির তৈরি এসব অনর্থক বিষয় নিয়ে তারা শত শত বই লিখছেন, হাজার বছর ধরে বিতর্ক করে যাচ্ছেন। অথচ গোটা মুসলিম জাতি এখন পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ধর্মহীন সভ্যতা দাজ্জালের গোলাম। তাদের এই দুর্দশাময় পরিস্থিতির জন্য দায়ী জাতির কথিত আলেম সাহেবরা, ফেরকা সৃষ্টিকারী ইমামগণ, দীনের অতি বিশ্লেষণকারী মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুজতাহিদ, মুফতিগণ, ভারসাম্যহীন সুফিবাদী পীর, মাশায়েখ, বুজুর্গানে দীনেরা। তারা তাদের অনুসারী তৈরি করেছেন, রসুলের (সা.) হাতে গড়া জাতি ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রাণহীন লাশে পরিণত হয়েছে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামের প্রতিটি আমলের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। অন্য কোনো উদ্দেশে আমল করা হলে সেটা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না, সেটার বিনিময়ও আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে না। কেয়ামতের দিন এমন একজন 'আলেমকে' উপস্থিত করা হবে যে দীনের জ্ঞান অর্জন করেছে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কোর'আন পাঠ করেছে। অতঃপর তাকে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হবে। সেও তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, "আমার দেয়া নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ?"

সে বলবে, "আমি আপনার দেওয়া নেয়ামতের বিনিময়ে দীনের জ্ঞান অর্জন করেছি, অন্যকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্যে কোর'আন পাঠ করেছি।" আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছো; বরং তুমি এই জন্যে বিদ্যা শিক্ষা করেছিলে যাতে করে মানুষ তোমাকে আলেম বলে। আর এই জন্যে কোর'আন পাঠ করেছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। পৃথিবীতে তোমাকে এই সব বলা হয়ে গেছে।" এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ দেয়া হবে। অতঃপর নাক ও মুখের উপর উপুড় করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহ মুসলিমঃ কিতাবুল ইমারাহ)

যারা কোর'আন পাঠের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর রসুল কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে শিবল রা. বলেন, আমি রসুলাল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা কোর'আন পড় তবে তাতে বাড়াবাড়ি করো না এবং তার প্রতি বিরূপ হয়ো না। কোর'আনের বিনিময় ভক্ষণ করো না এবং এর দ্বারা সম্পদ কামনা করো না।' -মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৮; মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৫/২৪০; কিতাবুত তারাবীহ।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদিসে পাওয়া যায়, রসুলাল্লাহ (সা.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছ। তোমরা আল্লাহর কেতাব তেলাওয়াত করে থাকো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল বর্তমান। অদূর ভবিষ্যতে এমন এক যামানা আসবে যখন তীরের ফলক যেরূপ সোজা করা হয় লোকেরা কোর'আন তেলাওয়াতকে সেভাবে সোজা করবে। তারা দ্রুত তেলাওয়াত করে নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় করবে এবং এতে তাদের কোনো বিলম্ব সহ্য হবে না। (ভূমিকা, তাফসির ইবনে কাসীর)। সুতরাং পবিত্র কোর'আন পাঠ করে বা দীন শিক্ষা দিয়ে 'হাদিয়া' গ্রহণ করতে আল্লাহর রসুল সরাসরি নিষেধ করেছেন।

উবাদা ইবন সামিত (রা.) বলেন, "আমি আহলে-সুফফার কিছু লোককে লেখা এবং কোর'আন পড়া শেখাতাম। তখন তাদের একজন আমার জন্য একটি ধনুক হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। তখন আমি ধারণা করি যে, এ তো কোন মাল (সম্পদ) নয়, আমি এ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় তীরন্দাযী করবো।

এরপর রসুলাল্লাহর (স.) নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি: ইয়া রসুলাল্লাহ (স.)! আমি যাদের কোর'আন পড়া এবং লিখা শিখাই, তাদের একজন আমাকে হাদিয়া হিসেবে একটি ধনুক প্রদান করেছেন, যা কোনো সম্পদই নয়। আমি এ দিয়ে

আল্লাহর রাস্তায় তীরন্দাযী করবো। তিনি (স.) বলেন: তুমি যদি তোমার গলায় জাহান্নামের কোনো বেড়ি পরাতে চাও তবে তুমি তা গ্রহণ করো।' (আবু দাউদ, চতুর্থ খণ্ড, হাদিস-৩৩৮১)।

ঘটনাটি অত্যন্ত শিক্ষণীয়। লক্ষ্য করুন, তিনি কিন্তু ধনুকটি চেয়ে নেন নি, আশাও করেন নি বরং সেটা হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা এ ভেবে গ্রহণ করেন যে এটা তো কোনো ব্যক্তিস্বার্থে (সম্পদ) ব্যবহার করবেন না, বরং দীন প্রতিষ্ঠার জেহাদে এটি ব্যবহার করবেন। তবু তাঁর অন্তরে একটি দ্বিধা থেকে গেল, কারণ তিনি জানতেন দীনের বিনিময় গ্রহণ হারাম। তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য রসুলাল্লাহর (সা.) কাছে ঘটনাটি বললেন। উপহার হওয়া সত্ত্বেও, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সেটা ব্যবহার করা হবে জেনেও রসুলাল্লাহ সেটা গ্রহণ করতে দিলেন না।

প্রকৃতপক্ষে যে কোনো প্রকার ধর্মীয় কাজের বিনিময় গ্রহণ করতেই রসুলাল্লাহ নিষেধ করে গেছেন। ওসমান বিন আস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস। তিনি বলেন, রসুলাল্লাহ আমাকে আমার গোত্রের ইমাম (নেতা) নিযুক্ত করে বললেন, 'তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হলো। তুমি দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে এবং এমন এক ব্যক্তিকে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করবে যে আযানের কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ করবে না। (নাসাঈ, তিরমিযী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ) বিদায় হজ্বের দিন আল্লাহর রসুল যখন বললেন, "আজ যারা এই সমাবেশে উপস্থিত নেই তাদের কাছে যারা উপস্থিত রয়েছ তারা আমার এই কথাগুলো পৌঁছে দেবে।" সত্য প্রচারের এই যে দায়বদ্ধতা উম্মাহর উপর তাদের নেতা, আল্লাহর শেষ রসুল কর্তৃক অর্পিত হলো সেই দায়িত্ব কি উম্মাহ টাকার বিনিময়ে পালন করবে? আল্লাহর রসুল যা কিছু করেছেন তা কি তিনি অর্থের বিনিময়ে করেছেন? নাউজুবিল্লাহ। তিনি নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর নির্দেশে অতিবাহিত করেছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ তাঁকে এর বিনিময়ে কোনো মজুরি, সম্পদ, বিনিময় (payment, wealth, reward) গ্রহণ না করার জন্য অন্তত ছয়টি আয়াতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

(১) এবং তুমি তাদের নিকট কোনো মজুরি দাবি কোরো না। এই বাণী তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। (সুরা ইউসুফ ১০৪)

(২) বল! আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না। এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের দলভুক্ত নই। (সুরা সা'দ ৮৬)

(৩) ...বল! আমি এর (দীনের) বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে প্রেম-ভালোবাসা ও আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোনো মজুরি চাই না। (সুরা শুরা - ২৩)

(৪) (হে মোহাম্মদ!) তুমি কি তাদের নিকট কোনো মজুরি চাও? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই তো শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রেযেকদাতা। (সুরা মুমিনুন: ৭২)

(৫) তবে কি তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছো যা ওরা একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে? (সুরা তুর: ৪০)

(৬) তাদেরকেই (নবীদেরকেই) আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর; বল! এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। (সুরা আনআম - ৯০)

সমসাময়িক ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নেওয়ার দরুন পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণও তাদের দ্বারা

WWW.HEZBUTTAWHEED.ORG

এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব

রসুলাল্লাহ (সা.) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অবহেলিত, উপেক্ষিত, পশ্চাৎপদ আরব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামরিক শক্তিসহ সকল বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত হয়েছিল। অনুরূপভাবে আজ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ষোল কোটি বাঙালিকে হেযবুত তওহীদ আহ্বান করছে, যদি কলেমা-তওহীদে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি মাত্র শর্ত পূরণ করা হয় তবে এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব।

তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
: 01782188237 | 01670174643 | 01711005025 | 01933767725

প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। তারা রুজি রোজগার বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি সম্মান ও কর্তৃত্ব খোয়ানোর আশঙ্কায় নবী-রসুলদের বিরুদ্ধে জনগণ ও শাসক শ্রেণিকে খেপিয়ে তুলেছেন এবং নবী রসুলদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আরোপ করেছেন। ঈসা (আ.) কে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করেছিল এই ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী কারণ তিনি তাদের মুখোশ জনগণের সামনে খুলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, কী নিকৃষ্ট আপনারা! আপনারা মানুষের সামনে জান্নাতে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে রাখেন। তাতে নিজেরাও ঢোকেন না আর যারা ঢুকতে চেষ্টা করছে তাদেরও ঢুকতে দেন না। একদিকে আপনারা লোকদের দেখাবার জন্য লম্বা লম্বা মোনাজাত করেন, অন্য দিকে বিধবাদের সম্পত্তি দখল করেন। (নিউ টেস্টামেন্ট: ম্যাথু ২৩)

প্রত্যেক নবী-রসুল তাদের জাতির উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় রয়েছে আল্লাহর কাছে। এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি যা তাদের সামনে উপস্থাপন করছেন তা নির্ভেজাল সত্য, হক্, এতে মিথ্যার কোনো লেশ নেই। মানুষ তখনই মিথ্যা বলে যখন তার কোনো স্বার্থ থাকে। বিনিময় গ্রহণ না করা তাঁদের সত্যময়তার বড় একটি নির্দেশক। এ বিষয়ে নবী রসুলদের (আ.) বেশ কয়েকজনের ঘোষণা আল্লাহ দৃষ্টান্তস্বরূপ পবিত্র কোর'আনেও সন্নিবদ্ধ করেছেন।

(১) নূহের (আ.) এর ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকট। (সুরা হুদ-২৯)

(২) নূহের (আ.) এর ঘোষণা: আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো কেবল বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। (সুরা শু'আরা ১০৯)

(৩) নূহের (আ.) এর ঘোষণা: যদি তোমরা আমার কথা না শোনো তাহলে জেনে রাখ, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই নি। আমার প্রতিদান কেবল আল্লাহর নিকট এবং আমাকে মুসলিম (সত্যের প্রতি সমর্পিত) হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। (সুরা ইউনুস ৭২)

(৪) হুদের (আ.) ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোনো মজুরি চাই না। আমার পারিশ্রমিক তাঁরই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তবুও বুদ্ধি (আক্‌ল) খাটাবে না? (সুরা হুদ-৫১)

(৫) হুদের (আ.) ঘোষণা: আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোনো মজুরি চাচ্ছি না। আমার পারিশ্রমিক তাঁরই নিকট যিনি এই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা। (সুরা শু'আরা ১২৭)

(৬) সালেহ (আ.) এর ঘোষণা: আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। (সুরা শু'আরা-১৪৫)

(৭) লুতের (আ.) ঘোষণা: এর জন্য আমি কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। (সুরা শু'আরা-১৬৪)

(৮) শোয়েবের (আ.) ঘোষণা: আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো মূল্য চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। (সুরা শু'আরা-১৮০)

ধর্মের কোনো কাজ করে নবী ও রসুলরা পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না, সুতরাং তাঁদের অনুসারী উম্মতের জন্যও পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয়। তথাপি নবীদের বিদায়ের পরে জাতির মধ্যে অবধারিতভাবে জন্ম নিয়েছে দীনের পণ্ডিত, ধারক বাহক, আলেম, পুরোহিত, যাজক নামধারী একটি অকর্মণ্য, কর্মবিমুখ, পরনির্ভরশীল শ্রেণি। তারা নিজেদেরকে নবী-রসুলদের প্রতিনিধি, ওয়ারিশ বা স্থলাভিষিক্ত (ওরাসাতুল আম্বিয়া) বলে দাবি করতে থাকেন কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের আদর্শের বিপরীতে গিয়ে ধর্মব্যবসায় মত্ত হয়ে যান।

পূর্ববর্তী কেতাবধারী জাতিগুলোর সেই অপকর্মের ইতিহাস পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বারংবার উল্লেখ করেছেন যেন রসুলাল্লাহর উম্মাহর আলেমরা পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট ধর্মব্যবসায়ী আলেমদের মত না হন। আল্লাহ বনী ইসরাইলকে বলেছিলেন, "তোমরা কেতাবের প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর তুচ্ছমূল্যে আমার আয়াত বিক্রি করো না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করো না। (সুরা বাকারা ৪১, ৪২)

কিন্তু আল্লাহর এ হুকুমকে তারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল এবং ধর্মকেই তাদের উপার্জনের মাধ্যম, স্বার্থসিদ্ধির উপকরণে পরিণত করেছিল। এর পরিণামে তারা আল্লাহর অভিশাপের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং শত শত বছর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর দ্বারা নির্যাতিত, নিপীড়িত হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে করুণার পাত্র হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল। এটা হচ্ছে পার্থিব শাস্তি। তাদের পরকালীন শাস্তি তো জমাই রয়েছে। তাদের ধর্মব্যবসা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ যখন তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই এটা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু তারা তা তাদের পেছনে নিক্ষেপ করল এবং খুব কম মূল্যে বিক্রয় করল, অতএব তারা যা কিনল তা নিকৃষ্টতর। (সুরা ইমরান ১৮৭)

তারা দীনের আইন-কানুন, আদেশ, নিষেধগুলোর চুলচেরা বিচার, পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করতে করতে সেগুলো বিকৃত করে ফেলে। সে ইতিহাসও আল্লাহ

বর্ণনা করেছেন, "তাদের (নবী ও প্রকৃত মো'মেন) পরে আসলো অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ, তারা সালাহ বিকৃত ও নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হলো। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে (সুরা মারইয়াম ৫৯)"।

আল্লাহর শেষ রসুল কর্তৃক আনীত ইসলামও তেরশ' বছর পূর্ব থেকে দীন বিকৃত হতে হতে কালের পরিক্রমায় আজ সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। যদিও কোর'আনের অক্ষরগুলো পরিবর্তিত হয় নি কিন্তু বাস্তবে যে ইসলামটি চর্চিত হচ্ছে সেটা আর আল্লাহ-রসুলের সেই সহজ সরল ইসলাম নয়। এই অবস্থা যে হবে সেটাও রসুলাল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তিনি বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন ১) ইসলাম শুধু নাম থাকবে, ২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, ৩) মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে সঠিক পথনির্দেশ (হেদায়াহ) থাকবে না, ৪) আসমানের নিচে নিকৃষ্টতম জীব হবে আমার উম্মাহর আলেম সমাজ, ৫) তাদের সৃষ্ট ফেতনা তাদের দিকেই ধাবিত হবে (আলী রা. থেকে বায়হাকি, মেশকাত)।

এই উম্মাহর আলেমদেরকে 'আসমানের নিচে নিকৃষ্ট জীব' বলার কারণ তারা হবে ধর্মব্যবসায়ী আলেম এবং তারা স্বার্থ হাসিলের জন্য ফেতনা সৃষ্টি করবে। বাস্তবেও আমরা দেখছি, মানুষের ঈমানকে হাইজ্যাক করে কীভাবে মিথ্যা গুজব রটিয়ে, কারো বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এই ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীটি। আর আল্লাহ ইসলাম নাযেলই করেছেন ফেতনা নির্মূল করার জন্য এবং মো'মেনদেরকে হুকুম দিয়েছেন ফেতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে (সুরা বাকারা ১৯৩, সুরা আনফাল ৩৯)।

ধর্মব্যবসায়ীদের একটি অংশ পীর সেজে বলছে, আমাদেরকে টাকা দাও, আমি তোমাদের নাজাতের অসিলা হবো। এদের বিষয়ে আল্লাহ পূর্বেই সতর্কবাণী ঘোষণা যে, "হে মো'মেনগণ! অধিকাংশ আলেম ও সুফিবাদীরা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে। তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা (সোনা ও রূপা) উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং সে সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ আস্বাদন করো। (সুরা তওবা ৩৪-৩৫)।" অথচ এইসব আলেম আর ভারসাম্যহীন সুফিবাদীদের কথায় কোটি কোটি মুরিদান নিজেদের জমি-জমা বিক্রি করে দিচ্ছে তাদের পায়ে সর্বস্ব ঢেলে দেয়, পীরদেরকে ভোট দেয়, তাদের আহ্বানে সংখ্যাধিক্যের অহঙ্কারে মুরিদানরা আস্ফালন করে, সুযোগ পেলেই তাণ্ডব ঘটায়, দেশ অচল করে দেওয়ার চেষ্টা চালায়।

ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে পবিত্র কোর'আনে আরো বহু আয়াত আছে, কিন্তু সেগুলোকে ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি গোপন করে তাদের হারাম উপার্জন চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা ভুলেও তাদের ওয়াজে, খোতবায় এগুলো উল্লেখ করেন না। কেউ যদি তাদেরকে এই আয়াতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তারা হাজারো অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে এ অবৈধ বাণিজ্য টিকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। পূর্ববর্তী ধর্ম-সম্প্রদায়ের আলেমরাও এভাবে ধর্মের অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কেতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে (সুরা ইমরান ৭৮)।" সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কেতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে: এটা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। তাদের হাত যা রচনা করেছে, তার জন্য তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে এবং তারা যা উপার্জন করেছে সেজন্যও তারা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। (সুরা বাকারা ৭৯)।

আমাদের সমাজের ধর্মজীবীরাও ঠিক এমনভাবেই সুর করে ওয়াজ করেন যেন তারা আল্লাহ রসুলের কথাই বলছেন। কিন্তু আদৌ তা নয়। তারা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী একটি ইসলামকে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেন। তাদের কাজের ফলে দীন বিকৃত হয়ে যাওয়ায় মুসলিম জাতি বহু আগেই পথ হারিয়ে ফেলেছে। এখন তারা বিগত চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সংকটে পড়েছে। তারা সর্বত্র মার খাচ্ছে, উদ্বাস্ত হচ্ছে, তাদের দেশ ধ্বংস হচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ধর্মের নামে চলা সব অধর্মকে পরিহার করে সত্যের উপরে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আর যতদিন ধর্মব্যবসা চালু থাকবে ততদিন সত্য উদ্ভাসিত হতে পারবে না। তাই ধর্ম থেকে ধর্মব্যবসাকে পৃথক করতে হবে। এজন্য ধর্মব্যবসার ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।

লেখক: গবেষক ও সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

কেমন ছিলেন মাননীয় এমামুয্‌যামান?

রিয়াদুল হাসান

সম্পদ দুই প্রকার। জাগতিক সম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ। জাগতিক সম্পদ যার আছে সে দান করতে পারে, না থাকলে দান করতে পারে না। তেমনি আত্মিক সম্পদ যাঁর আছে সেই মহামূল্যবান সম্পদ তিনি অন্যকে দিতে পারেন। যার নেই সে দিতেও পারে না, তার কাছ থেকে কেউ নিতেও পারে না। মাননীয় এমামুয্‌যামান তাঁর জাগতিক সম্পদ সব আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে বলতে গেলে নিঃস্ব অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাতে চলে গেছেন। তাঁকে আল্লাহ দান করেছিলেন এক অদৃশ্য ধনভাণ্ডার যা উপচে পড়েছিল আধ্যাত্মিক সম্পদে। সেটা তিনি হেযবুত তওহীদের সদস্যদের মাঝে অকাতরে বিলিয়েছেন। এমামুয্‌যামানের সততা, ওয়াদা, আমানতদারী,

আতিথেয়তা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, একাগ্রতা, মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, উদারতা, দানশীলতা, সাহসিকতা, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কল, পাহাড়ের মতো অটলতা সবকিছু মিলিয়ে তিনি ছিলেন এমন এক মহামানব যাঁর সংস্পর্শে যেই এসেছে, তার ভেতরেই একটি পরিবর্তন এসেছে। কেবল কথা নয়, প্রাত্যহিক জীবনের অনেক ছোট-খাটো ঘটনার মাধ্যমেও তিনি আমাদেরকে বহুবিধ শিক্ষা প্রদান করে গেছেন। আজকে তেমন দু'একটি ঘটনা বলব।

দু'টি পাথর

২০০১ সনের কোনো এক সময়। নারায়ণগঞ্জে আল্লাহর তওহীদের বালাগ দেওয়ার সময় স্থানীয় ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাদের অপপ্রচারে প্ররোচিত কতিপয় সন্ত্রাসীর আক্রমণের শিকার হই। আহত অবস্থায় আমরা কয়েকজন ঢাকা চলে আসি। তখন আমি এমামুয্‌যামানের বাসায় বেশ কিছুদিন ছিলাম। তাঁর চিকিৎসায় আমি যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠেছি, একদিন সকালে কোনো একজন মোজাহেদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ৭ নম্বর সেক্টরের ভেতরের দিকে চলে গিয়েছি। সেখানে একটি বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, বাড়ির সামনে ইট বালি পাথর রাখা। ছোট বেলা থেকেই আমার গোল পাথর খুব ভালো লাগে। কোথাও সুন্দর পাথর দেখলেই আমি সংগ্রহ করতাম, জমিয়ে রাখতাম, পকেটে নিয়ে ঘুরতাম। আমাদের বাড়িতে গেলে হয়তো এখনও দু'একটি পাথর পাওয়া যাবে। তো সেই বাড়ির সামনে আমি কয়েকটি সুন্দর সুন্দর আকৃতির মসৃণ পাথর দেখতে পেলাম এবং নিয়ে আসলাম।

ঐ দিন বা তার পরদিন আমি এমামুয্‌যামানের সঙ্গে ক্লিনিকে গিয়েছি। বিকাল বেলায় যখন চেম্বার শেষে এমামুয্‌যামান আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, তখন দেখলাম এমামুয্‌যামানের টেবিলে পেপার ওয়েট নেই, কাগজপত্র উড়ে যাচ্ছে। এমামুয্‌যামান তাঁর সহকারী রাশেদ ভাইকে বললেন পেপার ওয়েট কেনার জন্য। তখন আমি আমার পকেট থেকে দুইটা পাথর বের করে এমামুয্‌যামানকে দিয়ে বললাম, 'এইগুলো দিয়ে পেপার ওয়েটের কাজ চালানো যাবে।' এমামুয্‌যামান মনোযোগ দিয়ে সেগুলো দেখলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পেয়েছ এগুলো?' আমি বললাম, 'একটি বাড়ির কন্সট্রাকশানের কাজ চলছিল। তার সামনে ইট বালি পাথর রেখেছে, সেখান থেকে

এনেছি'। এমামুয্যামান বললেন, 'তারমানে তো এগুলোর মালিক আছে। তুমি কি জিজ্ঞেস করে এনেছো?'

এমন প্রশ্নও যে উঠতে পারে তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। রাস্তার পাশ থেকে প্রায় মূল্যহীন দু'টো পাথর শখ করে এনেছি তাও জিজ্ঞেস করে আনতে হবে, আমি এতটা ভাবিই নি। আমি বললাম, 'না, কাউকে বলে আনি নাই তো।'

তখন তিনি আব্দুল কাদের জিলানী (র:) এর বাবার জীবনের সেই বিখ্যাত ঘটনাটি বললেন। ভদ্রলোক একদিন ক্ষুধার সময় নদীতে ভেসে আসা একটি ফলের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হয়, এ আমি কার গাছের ফল খেলাম? এই ভেবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নদীর উজানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। বহু পথ হেঁটে তিনি একটি বাগান দেখতে পেলেন যার কিছু ফলন্ত গাছ নদীর উপর ঝুঁকে আছে। তিনি বাগান মালিকের সাথে দেখা করে বিনা অনুমতিতে তার গাছের ফল খাওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলেন।

এই উদাহরণ দিয়ে এমামুয্যামান বললেন, 'পাথরগুলো তুমি যেখান থেকে এনেছো, সেইখানে রেখে আসবে।' আমি খুবই লজ্জিত হলাম এবং বললাম, 'জ্বি এমামুয্যামান'।

স্বনির্ভরতা:

এমামুয্যামান নিজের ঘরের লোক ছাড়া অন্য কোনো মোজাহেদ মোজাহেদাকে দিয়ে পারতপক্ষে কোনো ব্যক্তিগত কাজ করাতেন না। কোনো মিটিং-এ বসলে ফ্যানের রেগুলেটর বাড়ানো কমানোর জন্যও তিনি নিজেই উঠে যেতেন এবং এমনভাবে রাখতেন যে বাতাসের কোনো আওয়াজ না হয়, কিন্তু ঘরও ঠাণ্ডা হয়। তিনি যখন অত্যন্ত অসুস্থ, আমি গিয়েছি কাজ করতে। বিছানায় শুয়ে থাকেন। এমন অবস্থায় তিনি আশে পাশে ঘরের কাউকে খুঁজলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এমামুয্যামান, আপনার কী লাগবে আমাকে বলেন।' তিনি বললেন, 'ফ্যানটা একটু কমিয়ে দাও।' আমি ফ্যানের রেগুলেটর ঘুরালাম। তিনি যখন বললেন ঠিক আছে, তখন রাখলাম। এমামুয্যামান বললেন, 'যাজাকাল্লাহ (আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিন)'। আমি 'শুকরিয়াহ' বললাম।

ইন্তেকালের দশদিন আগে:

এমামুয্যামানের ইন্তেকালের দশদিন আগের ঘটনা। ঢাকার হাসপাতালগুলোতে টেস্ট করেও তেমন কিছু ধরা পড়ছে না, অথচ তিনি কয়েক মাস পূর্ব থেকে খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে আমরা সবাই মিলে অনেক অনুরোধ করে থাইল্যান্ডে চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাজি করলাম।

বিমানের ফ্লাইট দুপুর ১২ টায়। দশটার দিকে তাঁকে তাগাদা দেওয়া হলো যে- এমামুয্যামান, বিমানের সময় হয়ে এসেছে, এখনই রওনা দিতে হবে। এমামুয্যামান তখন শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল। আমরা বললাম- এমামুয্যামান, আপনি আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে নিচে নামুন, নইলে পড়ে যেতে পারেন। তিনি বললেন, না না, আমি একাই পারব। উপায়ান্তর না দেখে তাঁর স্ত্রী এগিয়ে গেলেন, বললেন, তার কাঁধে ভর দিয়ে নামতে। তিনি তার কাঁধেও ভর দিলেন না। একাই সিড়ির রেলিং ধরে ধরে ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন।

স্বল্পাহারী এমামুয্যামান:

আমার দেখা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর মানুষ হলেন এমামুয্যামান। এত অল্প খেয়ে কীভাবে জীবনধারণ করে তা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমার বহুবার এমামুয্যামানের সঙ্গে খেতে বসার সুযোগ হয়েছে। তিনি এক চামচ ভাত নিতেন, তারপর সেটুকু ধীরে ধীরে খেতেন। তরকারি এক বা দুই পদের বেশি নিতেন না। তাকে দুটো খেজুর বা বিস্কুট খেতে দেওয়া হলে দেখা যেত তিনি একটা খেয়েছেন, একটা রেখে দিয়েছেন। নফসকে নিয়ন্ত্রণের কাজটা কত কঠিন! আমরা প্রায়ই বলতাম, এত অল্প খেয়ে কীভাবে থাকেন? উনি বলতেন, 'এটা ছোট বেলা থেকে করা অভ্যাস। এটা হঠাৎ করে পারবে না। আমার বাবা-দাদা সবাই আমার চেয়েও কম খেতেন। শোনো, আমার চিকিৎসা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা বলি, মানুষ আসলে না খেয়ে মরে খুব কম, খেয়েই বেশি মরে। যারা বেশি খায় তারা রোগ-বালাইতে বেশি আক্রান্ত হয়। তাদের আয়ু হ্রাস পায়। এজন্য সব ধর্মের আধ্যাত্মিক সাধকগণ কামেলিয়াত অর্জনের একটা তরিকা হিসাবে কম খেয়ে থাকেন।"

এমামুয্যামান আমাদেরকে প্রায়ই রসুলাল্লাহর নসিহতের কথা বলতেন যে, তোমরা পেটকে তিন ভাগ করে এক ভাগ খাদ্য, এক ভাগ পানি আর এক ভাগ খালি রাখবে। আরো বলতেন, মো'মেন খায় এক পেটে আর কাফের খায় সাত পেটে। যারা গলা পর্যন্ত আহার করে আল্লাহ তাদের ঘৃণা করেন। যারা বেশি আহার করে এমামুয্যামান তাদেরকে এর ক্ষতিকারক দিকগুলো বুঝিয়ে বলতেন এবং অল্প খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন।

সাহসিকতা:

হেযবুত তওহীদের যাদের মধ্যে তিনি সাহসিকতার অভাব লক্ষ করেছেন তাদের সব সময় ভর্ৎসনা করতেন, তিরস্কার করতেন। এমামুয্যামানের বকা খাওয়ার ভয়ে তারা তাঁর সামনেও আসতে পারত না, মিটিংয়ের কোনায় গিয়ে বসে থাকত। আর যেখানে যারা সাহসিকতা নির্ভয় সাহস রেখে গেছেন তাদেরকে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন প্রশংসা করেছেন। তারা সবসময় তাঁর নিকটে অবস্থান করতেন। তিনি সবসময় কাপুরুষতা থেকে আল্লাহর নিকট পানা চাইতেন আর বলতেন কৃপণতা আর কাপুরুষতা - এ দুইটা জিনিস হলো মো'মেন হওয়ার প্রধান অন্তরায়।

তোমরা সাবধান থেকো। মো'মেন কেবল আল্লাহকে ভয় পাবে। বান্দা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে এটা তিনি পছন্দ করেন না।

তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটা ঘটনা প্রায়ই বলতেন। এমামুয্যামান ভারতীয়দের একটি মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন যেখানে হিন্দু-মুসলিম সবাই অংশ নিয়েছিল। এক পর্যায়ে মিছিলে ব্রিটিশ সৈন্যরা গুলি চালিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, সবাই দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করল। এমামুয্যামানও তাদের সঙ্গে দৌড় দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, আমি পাঠান। আমি পিঠে গুলি খেতে পারি না। তিনি বুক টান টান করে গুলি বর্ষণকারী সেপাইদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর চার পাশে তখন বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ হচ্ছে। অনেকের গায়েই গুলি লাগল, কিন্তু আল্লাহর রহমতে এমামুয্যামানের গায়ে কোনো গুলির আঁচড়ও লাগল না। তিনি সেদিন উপলব্ধি করেন যে আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। যখন মিছিল ভেঙে গেল, সৈন্যরা গুলি থামাল। একজন ব্রিটিশ সৈন্য এমামুয্যামানের কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল, "তুমি খুব সাহসী মানুষ।"

এমামুয্যামান ভারতীয়দের একটি মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন যেখানে হিন্দু-মুসলিম সবাই অংশ নিয়েছিল। এক পর্যায়ে মিছিলে ব্রিটিশ সৈন্যরা গুলি চালিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, সবাই দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করল। এমামুয্যামানও তাদের সঙ্গে দৌড় দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, আমি পাঠান। আমি পিঠে গুলি খেতে পারি না। তিনি বুক টান টান করে গুলি বর্ষণকারী সেপাইদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর চার পাশে তখন বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ হচ্ছে। অনেকের গায়েই গুলি লাগল, কিন্তু আল্লাহর রহমতে এমামুয্যামানের গায়ে কোনো গুলির আঁচড়ও লাগল না। তিনি সেদিন উপলব্ধি করেন যে আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

তিনি জীবনে অনেক বাঘ শিকার করেছেন। শিকারের সময় যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন দেখা গেছে বাঘের হুঙ্কার শুনে অনেকেই দৌড় দিয়ে গাছে উঠেছেন। বহুবার বাঘ শিকার করতে উনার সঙ্গে অনেকে গিয়েছেন কিন্তু বাঘের হুঙ্কার যখন হয়েছে তখন অনেকে পালিয়ে গাছে উঠেছে। কিন্তু তিনি স্থান ত্যাগ করেন নি। বাড়িতে তাঁর নিজের একটা পোষা চিতাবাঘ ছিল যা সরকারি আইন জারি হওয়ার পর বনবিভাগের কাছে হস্তান্তর করেন।

বিনিময় গ্রহণ না করা:

দীনের বিনিময় না নেওয়ার বিষয়ে এমামুয্যামান ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। কোনোভাবেই যেন আন্দোলনের কাজ করে কেউ কোনো পার্থিব স্বার্থ বা বিনিময় গ্রহণ না করে এ বিষয়ে তিনি সবাইকে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন। তওহীদের প্রচার করতে গিয়ে কোনো মানুষের থেকে কিছু খেতেও নিষেধ করেছেন। দীন শিক্ষা দেওয়ার এই দীর্ঘ পথে তিনিই সবাইকে খাইয়েছেন, নিজে কারো থেকে খান নি। যারাই তাঁর বাড়িতে গেছেন, না খেয়ে কেউ ফেরে নি। তিনি সবাইকে মৌখিক ও লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'কেউ আমার বাসায় আসলে কোনো কিছু কিনে আনবে না।' কেউ যদি কিছু কিনে নিয়ে যেত তাহলে তিনি তার দাম দিয়ে দিতেন। বলতেন, 'আমি পীর সাহেব না, এটা পীরের দরবারও না।'

তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়েছেন কর্ম করে খাওয়ার জন্য। কখনো বেকার থাকবে না, কারো উপর নির্ভরশীল হবে না।' তিনি পূর্বপুরুষের অঢেল সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও পরিশ্রম করে উপার্জন করেছেন। পেশায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক। এন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয় ৮৬ বছর। তখনও তিনি নিয়মিত রোগী দেখতেন এবং সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। অনেক রোগীকে তিনি বিনামূল্যেই চিকিৎসা করতেন। কেউ কোনো সমস্যায় পড়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি তাকে অবশ্যই সাধ্যমত সাহায্য করতেন। তিনি মাঝে মধ্যে বলতেন, "আমি সারাজীবনে মানুষকে যে পরিমাণ টাকা-পয়সা ধার দিয়েছি তারা যদি ফেরত দিত তাহলে বাকি জীবন কোনো কাজ করা লাগত না।"

তাঁর পূর্বপুরুষগণ বঙ্গের সুলতান ছিলেন। তাঁর বাবা-দাদারা ব্রিটিশ যুগের জমিদার ছিলেন বলে কলকাতায় পড়াশোনা করার সময় তাঁকে লোকেরা প্রিন্স বলে ডাকত। বিপুল বিলাস-ব্যাসনের সুযোগ পেয়েও কীভাবে তিনি কেমন করে একজন সাধক পুরুষের মত দুনিয়ার প্রতি এমন নিরাসক্ত ও নির্মোহ জীবনযাপন করলেন সেটা সত্যিই বিস্ময়কর।

এভাবেই একজন মহান পুরুষ তাঁর নীরবে নিভৃতে তাঁর দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সম্পদ মানুষের জন্য উজাড় করে দিয়ে গেছেন। আজ তাঁকে না জেনে বহুজনে বহুরকম মন্তব্য করেন। এটা তাদের অজ্ঞতা আর শাস্ত্রে একটি কথা আছে- অজ্ঞতা বড় পাপ। আমরা বিশ্বাস করি অজ্ঞতার এই অন্ধকার একদিন কেটে যাবে, সত্য উদ্ভাসিত হবে। তখন মানুষ তাঁকে জানবে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ, শিক্ষা বিশ্ববাসীকে শান্তির পথ দেখাবে।

লেখক: গবেষক ও সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

যারা হেযবুত তওহীদের সাথে কাজ করতে চান তাদের উদ্দেশে

মসীহ উর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

হেযবুত তওহীদ মানবতার কল্যাণে নিবেদিত একটি অরাজনৈতিক আন্দোলন যার প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। গত ২২ বছর যাবৎ হেযবুত তওহীদের সদস্যরা মাননীয় এমামুয্‌যামানের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের জীবন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিসর্জন দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে মানবতার কল্যাণে, মানুষের মুক্তির জন্য, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাজধানী থেকে শুরু করে দেশের সর্বত্র সভা, সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান, র‍্যালি, মানববন্ধন, জনসভা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান, পথসভা, আলেম সম্মেলনসহ লক্ষাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রত্যয়ে ব্রত হয়েছে হেযবুত তওহীদ। আমাদের এই কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে মহান আল্লাহপাকের দরবারে দুহাত তুলে দোয়া করছে অসংখ্য মানুষ। এছাড়া হেযবুত তওহীদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে মানবতার কল্যাণে কাজে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন বিশাল জনগোষ্ঠি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে কোটি কোটি শুকরিয়া, আমাদের মতো অতি তুচ্ছ, সাধারণ, গুনাহগার মানুষের কথায় তারা ঐক্যমত পোষণ করেছে এবং এই কাজে ব্রতী হবার আগ্রহ প্রকাশ করছে। তাই তাদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন, দোয়া এবং শুকরিয়া জানাচ্ছি।

হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের কিছু নীতিমালা এবং কর্মসূচি রয়েছে। এমামুয্‌যামান এই নীতিমালাগুলো আন্দোলনের শুরুতেই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ২০১২ সালের ১৬ জানুয়ারি তিনি আমাদের ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। আজও আমরা সেই নীতিমালা থেকে একবিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হইনি। যারা এর বিচ্যুতি ঘটাতে চেয়েছে বা ঘটিয়েছে তারা এই পবিত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারেনি। আলহামদুলিল্লাহ, সর্বময় ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহ তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে নতুন ও উদ্যোমীদের দিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে দিয়েছেন। তাই আমরা সর্বান্তকরণে বলতে পারি আল্লাহর স্নেহধন্য আন্দোলন হেযবুত তওহীদে কেউ যদি সত্যদীন প্রতিষ্ঠার কাজ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বা মতলবে এসে থাকেন তবে যথা সময়ে তা অবশ্যই প্রকাশিত হবে। তাই এ যাবত যারা হেযবুত তওহীদের এই মহতী উদ্যোগের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন তাদেরকেও এইসব নীতিমালা এবং কর্মসূচি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

একটি আন্দোলন পরিচালনা করতে কিছু নীতিমালা এবং কর্মসূচি অনুসরণ করতে হয়। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং সুপরিকল্পিত কর্মসূচি ছাড়া কোনো আন্দোলনই তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না। হেযবুত তওহীদের নীতিমালাগুলো হলো:

- হেযবুত তওহীদ চেষ্টা করবে আল্লাহর রসুলের (স.) প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করতে।
- আন্দোলনের কোনো সদস্য-সদস্যা অবৈধ কোনো অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না।
- কোনোরূপ বে-আইনী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।
- আন্দোলনের কেউ রাজনীতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হবে না।
- কেউ বেকার থাকতে পারবে না।
- কর্মক্ষম সবাইকে হালাল উপায়ে রোজগার করতে হবে।
- দ্বীনের কাজ করে কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না।
- সকল ধর্ম-বর্ণ-দল-মত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকার, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানিয়ে, জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে। কারণ এটা জাতির কাজ, তাই জাতির সবাইকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

এই সব নীতিমালা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। যারা বে-আইনী কর্মকান্ড করবে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্যবস্থা নিবে। প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না।

মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর রসুল (সা:) কে একটি পরিপূর্ণ কর্মসূচি দান করেছিলেন। যে কর্মসূচি অনুসরণ করে তৎকালীন সর্বদিক দিয়ে পশ্চাদপদ আরবজাতি, ঐক্য, শৃঙ্খলায়, ভ্রাতৃত্বে পৃথিবীর মধ্যে মহান আদর্শ স্থাপন করেছে। সেই কর্মসূচি স্বয়ং আল্লাহর রসুল তাঁর হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদীকে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা তা অনুসরণ করেছিলেন। সেই একই কর্মসূচি অনুসরণ করেই হেযবুত তওহীদ সত্যদীন, দীনুল হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ দফা ভিত্তিক এই কর্মসূচিটি রসুল (সা:) তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করার সময় বলেছিলেন- 'এই কর্মসূচি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। এখন আমি এই কর্মসূচি তোমাদের হাতে অর্পণ করে চলে যাচ্ছি।'

হাজার বছর ধরে চাপা পড়ে থাকা এই কর্মসূচিটি মহান

আল্লাহ আবারও অনুগ্রহ করে হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। সেই কর্মসূচি হলো:

১. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হবো। (ঐক্য)
২. যিনি নেতা হবেন তার আদেশ শুনবো। (শৃঙ্খলা)
৩. নেতার ঐ আদেশ পালন করবো। (আনুগত্য)
৪. অন্যায়, অসত্য, শিরক-কুফরের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবো। (হেজরত)
৫. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় সর্বাত্মক সংগ্রাম করবো। (জেহাদ)

"যে ব্যক্তি এই কর্মসূচির ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে গেল সে তার গলা থেকে ইসলামের বাঁধন খুলে ফেলল, যদি না সে আবার তওবা করে ফিরে আসে; এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের দিকে আহ্বান করল, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামাজ পড়লেও এবং রোজা রাখলেও সে অবশ্যই জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে। (আল হারিস আল আশয়ারী রা: থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত)।"

যারা হেযবুত তওহীদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন তারা কর্মসূচির প্রথম দফাটি পূরণ করেছেন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ন্যায় ও সত্যের পক্ষে নিজেকে এক আল্লাহর তওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ করেছেন। এরপর এই ঐক্যবদ্ধ জাতির কাজ কী? ঐক্য হওয়ার পর একজন নেতার আদেশ মানতে হবে। কারণ ঐক্য হবার পর যদি আমরা বিচ্ছিন্নভাবে যে যেভাবে পারি কাজ করি, তবে সেটা হবে উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, ফলাফলহীন বৃথা কাজ। একটি মালার পুতিঁগুলো যদি পাশাপাশি রাখা হয় তবে যে কোনো মুহূর্তেই পুঁতিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে হারিয়ে যেতে পারে। তাই তাকে একটি সুতা দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। বর্তমান মুসলিম জাতিটিকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখার জন্য কোনো নেতা না থাকায় ঐ ছড়ানো পুতিঁর মতো এক একজন এক এক দিকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই ঐক্য হওয়ার পরের দফা হলো এক নেতার আদেশ শুনতে হবে। তৃতীয় দফা হলো নেতার আদেশ শোনার পর তা জীবন-সম্পদ দিয়ে হলেও পালনের চেষ্টা করতে হবে। চতুর্থ দফাটি হলো যাবতীয় অন্যায়, অসত্য, শিরক-কুফর, আল্লাহ ও রসুলের নাফরমানি, ধর্মব্যবসা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, অপরাজনীতি, দুর্নীতি ইত্যাদি থেকে হেজরত করলাম অর্থাৎ নিজেদের মুক্ত করলাম। কোনো অবস্থাতেই আমরা কোনো অবৈধ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হবো না। আর সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দফা হলো প্রথম চারদফার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের পর আমরা মানবতার কল্যাণে, মানুষের মুক্তির জন্য, পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য, আমাদের জীবন-সম্পদ বিসর্জন দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করে যাব। যারা হেযবুত তওহীদের উপরোক্ত নীতিমালা আর কর্মসূচির সাথে ঐক্যমত পোষণ করবেন তারা একদিকে হবেন ইস্পাতসম ঐক্যবদ্ধ অন্যদিকে সাবের, সংকল্পে দৃঢ়। তাহলে তাদের ঈমান হবে একটা শক্তি। এই ঈমানের শক্তি এবং দেশপ্রেমের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, যাবতীয় সংকট থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন।

মানব কল্যাণই ইসলামের উদ্দেশ্য

সমাজে শান্তি স্থাপনের নামই ইসলাম।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন, আমাদের ফেইসবুক পেজে–

/ASUN.SYSTEM.TAKEI.PALTAI

সরাসরি স্ক্যান করে ভিজিট করুন

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হেযবুত তওহীদের বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা

হলি আর্টিজানে হামলার এক বছর

রাকীব আল হাসান

গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলার এক বছর পেরিয়ে গেলেও ঘটনাটি এখনও নানা কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে আছে। কারণ ঐদিন বাংলাদেশের মানুষ প্রথমবারের মত এই ধরনের নৃশংস হামলার কবলে পড়ে, খবরের শিরোনাম হয় বিশ্বব্যাপী। ২০১৬ সালের জুলাই এর ০১ তারিখের মধ্যরাত থেকে শুরু করে ০২ তারিখ সারাদিন দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে খবর ছিল একই বিষয় নিয়ে- গুলশানের হলি আর্টিজান নামের রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলা। ১লা জুলাই রাতেই জঙ্গিরা ২০ জনকে হত্যা করে যাদের মধ্যে ১৭ জন ছিলেন বিদেশি নাগরিক। তিন জন বাংলাদেশি। এছাড়া সন্ত্রাসীদের হামলায় দুজন পুলিশও প্রাণ হারান। পরের দিন সকালে সেনাবাহিনীর কমান্ডো অভিযানে ছয় জন নিহত হয়। আইএস এর পক্ষ থেকে এদের মধ্যে পাঁচজনকে তাদের সদস্য বলে দাবি করা হয়।

মর্মান্তিক এই ঘটনার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠনকে দেখা গেল নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে শোক প্রকাশ করতে। মিডিয়ায় সেদিনের ঘটে যাওয়া রোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। অনেককেই দেখা গেল হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হয়ে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করছেন। কিন্তু এসব আনুষ্ঠানিকতা দেশকে কতটুকু জঙ্গিবাদের ঝুঁকিমুক্ত রাখতে সক্ষম হচ্ছে?

গুলশান হামলা-পরবর্তী গত এক বছরের ঘটনা-পরিক্রমা মোটেও সন্তোষজনক নয়। এই সময়ে ক্রমাগত জঙ্গি হামলার সাক্ষী হয়েছে দেশবাসী। আর একটার পর একটা জঙ্গি আস্তানায় পুলিশী অভিযান তো চলছেই। আত্মঘাতী ভেস্ট পরে শিশুসহ নিজেদেরকে উড়িয়ে দেওয়ার মত ঘটনাও ঘটিয়েছে জঙ্গিরা। ব্যাপক ধর-পাকড়ের মুখে

গুলশান হামলা-পরবর্তী গত এক বছরের ঘটনাপরিক্রমা মোটেও সন্তোষজনক নয়। এই সময়ে ক্রমাগত জঙ্গি হামলার সাক্ষী হয়েছে দেশবাসী। আর একটার পর একটা জঙ্গি আস্তানায় পুলিশী অভিযান তো চলছেই। আত্মঘাতী ভেস্ট পরে শিশুসহ নিজেদেরকে উড়িয়ে দেওয়ার মত ঘটনাও ঘটিয়েছে জঙ্গিরা। ব্যাপক ধর-পাকড়ের মুখে জঙ্গিরা এখন কিছুটা রক্ষাণাত্মক অবস্থানে থাকলেও বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের ঝুঁকি নিয়ে দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ দেখছেন এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা, সামরিক বিশেষজ্ঞ, সরকারপ্রধানসহ অনেকেই বলছেন যে, কেবল শক্তি প্রয়োগ করে এই সঙ্কটের সম্পূর্ণ সমাধান আসবে না।

জঙ্গিরা এখন কিছুটা রক্ষাণাত্মক অবস্থানে থাকলেও বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের ঝুঁকি নিয়ে দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ দেখছেন এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা, সামরিক বিশেষজ্ঞ, সরকারপ্রধানসহ অনেকেই বলছেন যে, কেবল শক্তি প্রয়োগ করে এই সঙ্কটের সম্পূর্ণ সমাধান আসবে না। ট্যাকটিক্যাল স্ট্র্যাটেজির পাশাপাশি আদর্শিক লড়াইও করতে হবে। প্রয়োজন ব্যাপকভাবে জনগণের সচেতনতা।

এই সচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্বের কথা সবাই যদিও মুখে বলছেন, কিন্তু বাস্তবতা হলো এই উদ্যোগে খুব কম ব্যক্তি ও সংগঠনই নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন। গুলশান হামলা যখন হলো, কিছুদিনের জন্য দেশের পত্র-পত্রিকা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, টিভি চ্যানেল, সভা-সেমিনার ইত্যাদি সবকিছুতেই মুখ্য আলোচ্য হয়ে উঠেছিল গুলশান হামলার কথা, জঙ্গিবাদের কথা, দেশের নিরাপত্তার কথা। জঙ্গিবাদ নামক অভিশাপ থেকে দেশকে ও প্রিয় ধর্ম ইসলামকে রক্ষা করার উপায় তালাশ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন সকলেই। রাজপথ সরগরম করে তুলছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দলের নেতাকর্মীরা। সরকারি দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা এল পাড়ায় পাড়ায় জঙ্গিবাদবিরোধী কমিটি গঠন করার, মানুষকে সচেতন করার। প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, মানববন্ধন ইত্যাদিও চলতে থাকল। কিন্তু দিনকতক যেতেই গুলশান হামলার কথা মানুষ ভুলে যেতে লাগল, আর অন্য দশটা ইস্যুর মতই জঙ্গিবাদকে কেবলই একটি ইস্যু ভেবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হলো, আলোচনায় স্থান করে নিল অন্য কোনো ঘটনা, অন্য কোনো ইস্যু।

রাজপথ সরগরম করে তুলছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দলের নেতাকর্মীরা। সরকারি দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা এল পাড়ায় পাড়ায় জঙ্গিবাদবিরোধী কমিটি গঠন করার, মানুষকে সচেতন করার। প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, মানববন্ধন ইত্যাদিও চলতে থাকল। কিন্তু দিনকতক যেতেই গুলশান হামলার কথা মানুষ ভুলে যেতে লাগল, আর অন্য দশটা ইস্যুর মতই জঙ্গিবাদকে কেবলই একটি ইস্যু ভেবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হলো, আলোচনায় স্থান করে নিল অন্য কোনো ঘটনা, অন্য কোনো ইস্যু।

এরপরেও অনেকগুলো জঙ্গি হামলা হয়েছে, জঙ্গিদের আস্তানায় পুলিশের অভিযানের ঘটনা ঘটেছে, সেনাবাহিনী দিয়ে জঙ্গিদের মোকাবেলা করতে হয়েছে, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু তা কেবল একদিন বা দুইদিনের খবরের কাগজে আলোড়ন তুলেই শেষ, এ নিয়ে বিশেষ কোনো গরজ কেউই দেখান নি এবং জাতিকে ব্যাপকভাবে এই জঙ্গিবাদের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করতে কোনো সংগঠন, আন্দোলন, রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দলকেই এগিয়ে আসতে দেখা যায় নি। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল হেযবুত তওহীদ।

এ পর্যন্ত আমরা অন্তত ৮৫ হাজার আলোচনা সভা, জনসভা, র‍্যালি, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, মানববন্ধন, পথসভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করে যাবতীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে জাতির কল্যাণে আমাদের নিবেদিতপ্রাণ সদস্যরা খেয়ে না খেয়ে, রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে ছুটে গেছেন শহর-বন্দর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। মানুষকে বুঝিয়েছেন জঙ্গিবাদের গোড়ার কথা; আরও বুঝিয়েছেন প্রকৃত ইসলাম কেমন ছিল, কেমন করে বিকৃত হলো এবং বিকৃত হবার পরে কীভাবে ইসলামের নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি স্বার্থ হাসিল করছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধাচ্ছে এবং রক্তপাতের জন্ম দিচ্ছে। কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তিগুলো জাতির ধর্মপ্রাণ তরুণদের ঈমানী চেতনাকে অপব্যবহার করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলামকে কলঙ্কিত করছে- সেটাও হেযবুত তওহীদ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করছে। আমাদের এই আত্মনিয়োগ জাতিকে কতখানি উপকৃত করেছে তা পত্রিকায় প্রকাশিত পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি মো: মনিরুজ্জামানের একটি উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত ৮ এপ্রিলের দৈনিক ইত্তেফাকের এক প্রতিবেদনে তিনি বলেন, ''জঙ্গিদের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রথম দিকে ব্যাপক প্রচারণা না থাকার কারণেই সাধারণ মানুষ হয়তো সহযোগিতা করতে পারেনি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনের জঙ্গি বিরোধী প্রচারণার কারণে সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।'' হেযবুত তওহীদের নাম উচ্চারণ না করলেও তিনি যে ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনের কথা বললেন সে কথা যে একমাত্র হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের ক্ষেত্রেই ভালোভাবে প্রযোজ্য হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ হেযবুত তওহীদ ছাড়া অন্য কোনো সামাজিক সংগঠন বা আন্দোলনকেই আমরা ব্যাপকভাবে সারা দেশে জঙ্গিবাদবিরোধী গণসচেতনতায় অবদান রাখতে দেখি না, একমাত্র হেযবুত তওহীদই এই দাবিটা করতে পারে। গুলশান হামলার বহু পূর্বেই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের ঝুঁকি তৈরি হলে আমরা মাঠে নেমেছিলাম জঙ্গিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে দেশকে রক্ষা করতে। আজও আমরা মাঠে আছি এবং যতদিন দেশকে জঙ্গিবাদের ঝুঁকি থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে সক্ষম না হচ্ছি ততদিন ইনশা'আল্লাহ পিছনে ফিরে তাকাব না।

লেখক: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক,
হেযবুত তওহীদ

তবে কি জাতির ধ্বংসই অনিবার্য?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

এক ভয়াবহ ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হয়েছে আমাদের মুসলিম জাতি। পৃথিবীময় খণ্ড-বিখণ্ড আকারে ছড়িয়ে থাকা ১৬০ কোটির এই বিশাল জাতিটির অবস্থা হয়েছে ফুটবলের মত, যে যেখানে পারছে এই জাতির সদস্যদের উপর আঘাত করে যাচ্ছে। তাদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে, হত্যা-ধর্ষণ করছে, বাড়ি-ভিটে থেকে উচ্ছেদ করছে, দেশ ধ্বংস করে দিচ্ছে। ছোট ছোট শিশু, নারী, বৃদ্ধ কেউই রেহাই পাচ্ছে না। আবার শুধু যে বাইরের শত্রু দ্বারাই আক্রান্ত হচ্ছে তাও কিন্তু নয়, নিজেরা নিজেরাও হানাহানি-রক্তপাত করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। যেন হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মত এই জাতিটিকে কেউ টেনে নিতে চাইছে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে, আর এরাও আগ-পাছ না ভেবেই অন্ধের মত মৃত্যুখাদের কিনারে পৌঁছে যাচ্ছে।

একটা সময় পৃথিবীময় ইহুদিরা মার খেয়ে বেড়াত। যেখানে যেত অপমান আর নিগ্রহ তাদের পেছনে পেছনে যেত। গোলামির জীবনই তাদের নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ তাদেরকে আল্লাহর নবী ঈসা (সা.) ও দাউদ (আ.) লানত দিয়েছিলেন। আজ আমাদের করুণ বাস্তবতা এই যে, আমাদের পরাজয়, গোলামি, অপমান আর নিগ্রহের বেদনাদায়ক ইতিহাস ঐ ইহুদিদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। শুধু পার্থক্য এই যে, তারা মার খেয়েছে ইউরোপে আর এই জাতি মার খাচ্ছে সারা দুনিয়ায়।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমরা হাজার বছর ধরে দেশটিতে বসবাস করে আসলেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তাদেরকে বিদেশি আখ্যা দিয়ে জাতিগত নিধনযজ্ঞ চালানো হচ্ছে, আর একাজে ধর্ষণকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। নারী-শিশুকে ঘরে তালাবদ্ধ রেখে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুরুষদেরকে গুলি করে ও জবাই দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। তাদের না আছে থাকার জায়গা, না আছে পালানোর জায়গা। কিন্তু পৃথিবীর ১৬০ কোটি মুসলমান তাদের সাহায্যার্থে কিছুই করতে পারল না।

কম্যুনিস্ট বিপ্লব হবার পর থেকে চীনে মুসলমানরা মার খাচ্ছে। রোজা রাখা, আজান দেওয়ার অধিকারটুকুও তাদের নেই। বিগত রমজানে রোজা রাখার অপরাধে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে ১০০ মুসলিমকে গ্রেফতার করা হয়। হত্যা, নির্যাতন, জেল, ফাঁসি তো রোজকার ঘটনা।

আফগানিস্তান গত কয়েক দশক ধরে যুদ্ধের দাবানল জ্বলছে। যুদ্ধ, রক্তপাতটাই সেখানকার স্বাভাবিক চিত্র। লাখো মুসলমানের রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে একবার দেশটি কম্যুনিস্টদের নিয়ন্ত্রণে যায়, পরোক্ষণেই জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণে যায়, আবার আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে যায়। সর্বক্ষেত্রেই প্রাণ হারায় মুসলমান, ধ্বংস হয় মুসলমানের দেশ।

সত্তর বছর ধরে ফিলিস্তিনের মাটিতে ফিলিস্তিনীদেরকেই নিধন করছে ইহুদিবাদী ইসরাইল। বেছে বেছে মুসলিম শিশুদেরকে গুলি করে মারা হচ্ছে। শক্তিধর ইজরাইলের আগ্রাসনের শিকার হয়ে ফিলিস্তিনিরা এখন নিশ্চিহ্ন হবার পথে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচাইতে বড় গণহত্যাটি হয়েছে যেখানে সেটা হচ্ছে বসনিয়া। বসনিয়ায় খ্রিষ্টান সার্বরা যা করেছে তার নজির মানুষের ইতিহাসে নেই। সার্বরা ৭০ হাজার মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করেছে, তাদের সাত মাস পর্যন্ত আটকে রেখেছে যাতে তারা খ্রিষ্টানদের ঔরসজাত সন্তানগুলো গর্ভপাত করে ফেলে দিতে না পারে। একইভাবে চেচনিয়ায় মুসলিমদেরকে গুলি করে, ধারাল অস্ত্র দিয়ে, ট্যাঙ্ক দিয়ে পিষে হত্যা করা হয়েছে, তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যেয়ে

ইসলামের প্রকৃত সালাহ্

আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মতে মোহাম্মদীর যে চরিত্র অপরিহার্য সেই চরিত্র তৈরির প্রশিক্ষণ হচ্ছে সালাহ (নামায)। অথচ সেই উদ্দেশ্যকে ভুলে আজ সালাহকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সওয়াবের মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছে। যে সালাহ উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা উম্মাহ আজ হাজারো পথে বিভক্ত। কারণ সালাহর প্রকৃত রূপ হারিয়ে গেছে। ইসলামের প্রকৃত সালাহর রূপ জানতে প্রতিটি সত্যানুরাগী মানুষের বইটি পড়া জরুরি।

hezbuttawheed.org

যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩ । ০১৭১৯১০০৫০২৫ । ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫ । ০১৭৮২১৮৮২৩৭

ধর্ষণ করা হয়েছে নয়ত বেশ্যালয়ে বিক্রি করা হয়েছে।

এদিকে ৭০ বছর ধরে উত্তাল কাশ্মির। আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির মারপ্যাঁচে কাশ্মিরীরা যেন দাবার ঘুঁটি। সেই ঘুঁটি যেদিকেই চালা হোক কাশ্মিরী মুসলমানদের ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। সেখানে এমন পরিবার কমই আছে যাদের কেউ না কেউ অন্যায়ভাবে প্রাণ হারায় নি।

ইতালি, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন উপনিবেশিক শক্তি আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান দেশ দখল করে নির্যাতন-নিপীড়ন-খুন-ধর্ষণ ও সেই সাথে অবাধ শোষণ আর লুটতরাজ চালিয়ে দেশগুলোকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আফ্রিকানদের স্বর্ণ ও হীরার খনি এখন ইউরোপকে সমৃদ্ধ করছে, আর আফ্রিকান কঙ্কালসার মানুষগুলো না খেয়ে মারা যাচ্ছে।

লিবিয়াকে বলা হত আফ্রিকার ত্রাতা। কথিত আরব বসন্তের কাঁধে সওয়ার হয়ে পশ্চিমারা সেই লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে এখন মানুষের বসবাসের অনুপযোগী করে ছেড়েছে। আকাশ থেকে বিমান হামলা করে খুব সহজেই মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে ক্ষমতাচ্যুত করে দিয়েছে এবং দেশটির তেলের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু সেখানকার মুসলমানরা মরল কি বাঁচল, খেতে পেল কি অভুক্ত রইল সেদিকে কেউ ফিরেও তাকায় নি। এখন যখন সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত লিবিয়া থেকে মুসলমান পরিবারগুলো জীবন বাজি রেখে নৌকায় করে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইউরোপে ঢোকার চেষ্টা করছে, কিংবা আমেরিকার ভিসা খুঁজছে, তখন ইউরোপীয়রা রে রে করে তেড়ে আসছে, আর আমেরিকার মুসলিমবিদ্বেষী প্রেসিডেন্ট নির্দেশ জারি করছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মুসলমানদের অধিকার নেই আমেরিকার মাটিতে পদস্পর্শ করার। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেবল ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে পানিতে ডুবেই প্রাণ হারিয়েছে দশ হাজার মুসলিম শরণার্থী। ইহুদীদেরও আল্লাহ এমন শাস্তি দেন নাই। এই যদি লানত না হয় তবে লানত কাকে বলে?

এই জাতি যে আল্লাহর অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে তার একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে বিশ্বময় অন্যান্য জাতিগুলো যখন আদাজল খেয়ে নেমেছে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, তখন এই জাতি ঐক্যবদ্ধ হবার বদলে নিজেদের মধ্যে বিভেদের নালাকেই প্রসারিত করে সাগরে পরিণত করছে এবং তার দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের কাজটাকে পানির মত সহজ করে দিচ্ছে। সৌদি আরবের নেতৃত্বে সুন্নিরা জোট করেছে, আর ইরানের নেতৃত্বে শিয়ারা। এই সুন্নিরা শিয়াদেরকে যতটা ঘৃণা করে ততটা পাশ্চাত্যের ইসলামবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেও করে না, একইরকম ঘৃণা শিয়ারাও লালন করে সুন্নিদের প্রতি। আর এই সুযোগটাই নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলো। তারা কেউ 'শিয়াজুজু'র ভয় দেখিয়ে সুন্নি জোটের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে, আর কেউ 'সুন্নিজুজু'র ভয় দেখিয়ে শিয়াদের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। গোপনে গোপনে উভয়পক্ষকেই কুমন্ত্রণা দিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লাগিয়ে রাখছে, উভয়পক্ষের কাছেই অস্ত্র সরবরাহ করছে এবং অস্ত্রব্যবসা করে নিজেরা লাভবান হচ্ছে। আর এই উম্মাহ বলির পাঁঠা হয়ে প্রভু সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে নিজেরা ধ্বংস হচ্ছে। আজকে তাদের শিয়া-সুন্নি বিরোধের খেসারত দিতে হচ্ছে সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেনের লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে বোমায় লণ্ডভণ্ড হয়ে, ঘরবাড়ি হারিয়ে, অভুক্ত-অনাহারি থেকে। সিরিয়ায় গত ছয় বছরে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে যাদের সবাই মুসলিম, আর উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দেশটির মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি হবে, অন্তত এক কোটি। ইরাকে চলছে মরার উপর খারার ঘা। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইয়েমেন সবচাইতে বড় দুর্ভিক্ষের মুখোমুখী হতে চলেছে কেবলই শিয়া-সুন্নি বিরোধ ও সৌদি আরবের সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে। এই নেতারা কী জবাব দিবেন আল্লাহর কাছে তা একমাত্র তারাই জানেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মুসলিমের প্রাণ ঝরে যাওয়ার পেছনে নিজেদের দায় একজনও অস্বীকার করতে পারবেন না।

২০১১ সাল থেকে সিরিয়া দেশটির উপর কী নির্যাতনটাই না চলছে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো, আঞ্চলিক শক্তিগুলো, এছাড়াও ছোট ছোট বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী সবাই সিরিয়ায় নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে মেতে আছে এবং তা করতে গিয়ে শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের প্রাণ গেছে। কিন্তু গোড়ায় গেলে দেখি সিরিয়া এখন কারো নয়, ঐ আসাদ সরকারেরও নয় ঐ বিদ্রোহীদেরও নয়, ঐ শিয়ারও নয় ঐ সুন্নিরও নয়, সিরিয়া এখন রাশিয়া এবং আমেরিকার। সিরিয়া ভাগ হয়ে টুকরো টুকরো হবে নাকি অখণ্ড থাকবে, যুদ্ধ বন্ধ হবে নাকি পরাশক্তিগুলোর ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করবার স্থান হবে সেই সিদ্ধান্তও নেবার ক্ষমতা ঐ রাশিয়া এবং আমেরিকার হাতে। তাহলে শিয়া-সুন্নি বিরোধ জাতিকে কী দিল? দিল সেই পরাজয়, অপমান, লাঞ্ছনা আর গোলামি যেটা তারা পৃথিবীময় কয়েক শতাব্দী ধরে ভোগ করে আসছে। একই অবস্থা লিবিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য যুদ্ধবিধ্বস্ত মুসলিম দেশগুলোর। জাতির যে অংশটি এখনও এই বিভীষিকার বাইরে আছে এবং পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনে নিজ জাতির দুর্বিষহ জীবনের চিত্র দেখেও নির্বিকারভাবে খাচ্ছে দাচ্ছে, বংশবিস্তার করছে, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে যাচ্ছে, আর ভাবছে এ সমস্যা তাদের নয়, তাদের এই আত্মতৃপ্তির বেলুনও একদিন ফুটো হবে। ইতোমধ্যেই প্রত্যেকটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে জঙ্গিবাদ। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সরকার দমন-পীড়নের নীতি গ্রহণ করলে সাধারণ ধর্মভীরু মানুষকে বোঝানো হচ্ছে ইসলামের প্রতি আঘাত হিসেবে। দেশে দেশে দানা বাঁধছে গণঅসন্তোষ। সরকার ও জনগণ দুই মেরুতে সরে যাচ্ছে। অস্থিতিশীলতা সর্বত্র। শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বের বলয়ে ইচ্ছে না থাকলেও জড়িয়ে পড়ছে সকল মুসলিমপ্রধান দেশ। আর সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রব্যবসায়ীরা তো বসেই আছে মুসলমানদের অন্যৈকের নালাকে সাগর বানিয়ে সেই সাগরে জাতিটিকে ডুবিয়ে মারতে। মনে রাখতে হবে, সিরিয়ার মুসলমানরাও একদিন ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনের খবর পড়ে নির্বিকার থাকত, আজ তাদের শিশু সন্তানরা 'শবযাত্রা শবযাত্রা' খেলা করে। এই করুণ বাস্তবতা আজও যদি আমরা উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে কবে উপলব্ধি করব? এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কোন পথে আমাদের ভবিষ্যৎকে চালিত করব। আমরা কি এভাবেই সমূলে বিনাশ হয়ে যাব নাকি পরিত্রাণের কোনো উপায় আছে?

লেখক: কলামিস্ট ও সহকারী সাহিত্য সম্পাদক,
হেযবুত তওহীদ

এই যদি দাজ্জাল না হয় তবে দাজ্জাল কে?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

আখেরী নবীর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে সবচাইতে গুরুতর ও তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে দাজ্জালের বিষয়, যার ফেতনা থেকে রসুল (সা.) নিজেই পানাহ চেয়েছিলেন আল্লাহর কাছে। কিন্তু এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলিম জাতির অসচেতনতা ও অন্ধত্বের পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, ইতোমধ্যেই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে সমগ্র মানবজাতিকে দিয়ে আল্লাহর রব্যুবিয়াত ও উলুহিয়্যাত অস্বীকার করিয়ে নিজেকে রব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে এবং মুসলিম নামধারী জাতিটিসহ সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী স্রষ্টাহীন সভ্যতাই সেই দাজ্জাল যাকে আল্লাহর রসুল রূপকভাবে বর্ণনা করে গেছেন।

১৫৩৭ সালে ইংল্যান্ডের রাজা ৮ম হেনরির রাজত্বকালে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, মানুষের জাতীয় জীবনে আর ধর্মের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, ধর্মকে যদি সম্ভব হয় পুরোপুরি মানবজীবন থেকে বিতাড়িত করে ফেলা হবে, আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে জাতীয় জীবন থেকে অপসারণ করে কেবল মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হবে। রাষ্ট্রকে এই ধর্মহীনকরণের মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছিল দাজ্জালের অর্থাৎ একটি ধর্মহীন আত্মাহীন জড়বাদী সভ্যতার। এরপর বিগত কয়েকশ' বছরের পরিক্রমায় শৈশব কৈশোর পার হয়ে এই দানব এখন যৌবনে উপনীত হয়েছে, সারা পৃথিবী এখন এই স্রষ্টাহীন, আত্মাহীন বস্তুবাদী সভ্যতার পায়ে সেজদাবনত হয়ে আছে যেমনটা হাদিসের বর্ণনায় পাই।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বদাই মানুষ বিকৃতভাবে হলেও আল্লাহর হুকুম-বিধান মেনে এসেছে, রাজা ও পুরোহিতরা কখনও কখনও নিজেদের মনগড়া বিধান দিয়েছে কিন্তু সেটাকেও আল্লাহর বিধান বলেই চালানো হয়েছে, কখনই মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের চলার পথ নিজেরাই রচনা করে নেওয়ার মত চরম ধৃষ্টতা দেখায় নি। কিন্তু পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতার জন্মই হলো আল্লাহকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহর হুকুম-বিধানকে বাতিল করে দিয়ে, আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌমত্ব মানুষের নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে। এর চেয়ে গুরুতর ও সংকটজনক ঘটনা আর কী হতে পারে? স্বভাবতই এই ঘটনার পরিণতিও ভয়াবহতার সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অন্য কিছু বাদ দিলেও এই আল্লাহহীন, আত্মাহীন পশ্চিমা জড়বাদী সভ্যতা মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে যে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়ে ১৩ কোটি বনি আদমের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এবং বর্তমানে সারা পৃথিবীকে ভয়াবহ পরমাণু যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে সেটাকেও নিঃসংশয়ে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় বা সংকট বললে ভুল হয় না। আর এজন্যই হাদিসে দাজ্জালের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে বড় কিছু ঘটবে না (মুসলিম)।' এই সভ্যতা আপাতদৃষ্টিতে খ্রিষ্টীয় সমাজে জন্মগ্রহণ করেছে বলে মনে হলেও আদতে খ্রিষ্টানিটি ধর্মের গোড়াও ইহুদি ধর্মে প্রোথিত। তাই আল্লাহর রসুল বলেন, 'দাজ্জাল ইহুদি জাতির মধ্য থেকে উত্থিত হবে এবং ইহুদি ও মোনাফেকরা তার অনুসারী হবে (মুসলিম)।' মোনাফেক বলতে ঐসমস্ত নামধারী মুসলিমকে বুঝিয়েছেন যারা একদিকে প্রতিনিয়ত সাক্ষ্য দিচ্ছেন আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (হুকুমদাতা) নেই, অন্যদিকে আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রত্যাখ্যান করে জীবনে দাজ্জালের তৈরি হুকুম-বিধান মেনে নিয়েছেন। এমন দ্বিমুখী নীতি অবশ্যই মোনাফেকের চরিত্র।

আজকে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা কার্যত মানবজাতির রবের ভূমিকায় উপনীত হয়েছে। তার দাবি হচ্ছে, 'তোমরা যে যার মত ধর্মকর্ম কর আমার আপত্তি নাই, কিন্তু সেটা যেন ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভুলেও জাতীয় জীবনে আল্লাহ, রসুল, ধর্মকে টেনে এনো না। সেখানে কেবল আমার হুকুম-বিধান চলবে।' দাজ্জালের এই দাবির কথাও আল্লাহর রসুল বলে গেছেন আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বেই। তিনি বলেন, 'দাজ্জাল নিজেকে মানুষের রব বলে ঘোষণা করবে এবং মানবজাতিকে বলবে তাকে রব বলে স্বীকার করে নিতে (বোখারী)।'

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এই সভ্যতা নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে এই সভ্যতা পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে সব জানতে পারছে। পৃথিবীর একপ্রান্তে কিছু হলে মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ছে অপর প্রান্তে। এই শ্রবণক্ষমতা বোঝানোর জন্য আল্লাহর রসুল বলেন, 'দাজ্জালের বাহনের দুই কানের মধ্যে দূরত্ব হবে সত্তর হাত (বায়হাকী, মেশকাত)।' আরবিতে সত্তর বলতে অসংখ্য বোঝায়। অর্থাৎ বোঝানো হচ্ছে দাজ্জালের বাহনের দুই কানের মধ্যে অসংখ্য দূরত্ব থাকবে। আসলে কথাটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে যা থেকে বোঝা যায় দাজ্জাল দূর-দূরান্তের খবরও জানতে পারবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার তৈরি এরোপ্লেন যখন আকাশ দিয়ে উড়ে যায় তখন সেটাকে বায়ুতাড়িত অর্থাৎ

জোর বাতাসে চালিত মেঘের টুকরোর মত দেখায়। তাই রসুল বলেন, 'দাজ্জালের গতি হবে অতি দ্রুত। বায়ুতাড়িত মেঘের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চলবে (মুসলিম, তিরমিযি)।' মেঘে রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের ঘটনা প্রায়ই পত্র-পত্রিকা মারফতে জানতে পারি আমরা। এ কথাটি রসুল বলে গেছেন যে, 'দাজ্জালের আদেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে (প্রাগুক্ত)।' তথ্যাভিজ্ঞ প্রতিটি লোকই জানেন যে, ইউরোপ, আমেরিকায় অর্থাৎ পাশ্চাত্য জগতের Cattle অর্থাৎ গরু-মহিষ-বকরি ইত্যাদির আকার বাকি দুনিয়ার ঐসব গৃহপালিত পশুর চেয়ে অনেক বড়, চার-পাঁচগুণ পর্যন্ত বেশি দুধ দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি দিয়ে এই অসম্ভবটি সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়েও আল্লাহর রসুল বলেন, 'দাজ্জালের গরু-গাভী, মহিষ, বকরি, ভেড়া, মেষ ইত্যাদি বড় বড় আকারের হবে এবং সেগুলোর স্তনের বোটা বড় বড় হবে (যা থেকে প্রচুর দুধ হবে) (প্রাগুক্ত)।' এক শতাব্দী পূর্বেও যেখানে মানুষ মাটির নিচের সম্পদ তুলে আনা তো দূরের কথা, এই সম্পর্কে খুবই সীমিত ধারণা রাখত, আজকে এই সভ্যতা আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই সেই সম্পদকে হস্তগত করছে ও সুবিধামত ব্যবহার করছে। এ কথাটিই আমরা পাই হাদিসে এইভাবে যে, 'দাজ্জাল মাটির নিচের সম্পদকে আদেশ করবে ওপরে উঠে আসার জন্য এবং সম্পদগুলো ওপরে উঠে আসবে এবং দাজ্জালের অনুসরণ করবে (প্রাগুক্ত)।'

জড়বাদী বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা জীবনের ভারসাম্যের একটা দিক, আত্মার দিক, পরকালের দিক, অদৃশ্যের (গায়েব) দিক, সত্যের দিক দেখতে পায় না, তার সমস্ত কর্মকাণ্ড জীবনের শুধু একটা দিক নিয়ে, দেহের দিক, জড় ও বস্তুর দিক, যন্ত্র ও যন্ত্রের প্রযুক্তির দিক, ইহকালের দিক। তাই বিশ্বনবী বলেছেন, দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে (বোখারী, মুসলিম) অর্থাৎ সে কেবল একটি দিক দেখতে পাবে, যেটা বাম চোখ দিয়ে দেখা যায়। এই ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে তার বাঁ চোখ দিয়ে এই মহাবিশ্ব, এই বিশাল সৃষ্টিকে দেখতে পায়। কিন্তু তার ডান চোখ অন্ধ বলে এই সৃষ্টির স্রষ্টাকে দেখতে পায় না; অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল মহাকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তু যে এক অলংঘনীয় বিধানে বাঁধা আছে তা দাজ্জাল তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু ডান চোখ নেই বলে এই মহাবিধানের বিধাতাকে দেখতে পায় না। শিশুর জন্মের আগেই মায়ের বুকে তার খাবারের ব্যবস্থা করা আছে তা দাজ্জালের চিকিৎসা বিজ্ঞান তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু যিনি এ ব্যবস্থা করে রেখেছেন সেই মহাব্যবস্থাপককে সে দেখতে পায় না, কারণ তার ডান চোখ অন্ধ।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে আমরা কি তবে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার তৈরি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদিকে দাজ্জাল বলছি? মোটেও কিন্তু তা নয়। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিই দাজ্জাল নয়, দাজ্জালের বাহনমাত্র। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি নিজে ভালো বা মন্দ হতে পারে না, ভালো বা মন্দ হতে পারে সেগুলোর ব্যবহার। একটি অস্ত্র দিয়ে নিরীহ মানুষ খুন করা যায়, আবার পুলিশের হাতে থাকলে নিরীহ একজন মানুষকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বাঁচানোও যায়, এতে অস্ত্রের কোনো দায় নেই, দায় সেই অস্ত্রের ব্যবহারকারীর। পাশ্চাত্য সভ্যতা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অপব্যবহার করছে বলে তো আর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিই নাজায়েজ হয়ে যেতে পারে না।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা আজকে সমস্ত পৃথিবীর স্থলভাগ ও সমুদ্র আচ্ছন্ন করে আছে। সারা পৃথিবীকে এই সভ্যতা তার হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে। তার ইচ্ছার বাইরে যায় এমন কোনো শক্তি নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসুল বলেন, 'দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি আচ্ছন্ন করবে। সমস্ত পৃথিবী চামড়া দিয়ে জড়ানো একটি বস্তুর মত তার করায়ত্ত হবে (মুসনাদে আহমদ)।'

মানুষ শান্তি ও সমৃদ্ধির উপায় তালাশ করে, স্বর্গসুখের স্বপ্ন দেখে। এই স্রষ্টাহীন সভ্যতা তাদেরকে বলছে- শান্তি তার কাছে আছে। মানুষের জাতীয় জীবন থেকে আল্লাহর হুকুমকে নির্বাসন দেওয়ার পর এই সভ্যতা

যে ধর্মহীন আত্মাহীন জীবনব্যবস্থাগুলো তৈরি করেছে সেগুলোই মানুষকে স্বর্গসুখ দিতে সক্ষম। দুর্ভাগ্যবশত মানবজাতি বারবার পাশ্চাত্য সভ্যতার এই আশ্বাসবাণী বিশ্বাস করেছে এবং ঠকেছে। যেমন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর বলা হয়েছিল স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন যেতেই দেখা গেল সেই স্বর্গরাজ্য থেকে পালাবার জন্য মানুষ জীবন বাজি রাখছে। বর্তমানে এই সভ্যতা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়াচ্ছে পৃথিবীময়, আর মানুষকে বোঝাচ্ছে স্বর্গসুখ আছে একমাত্র এই ব্যবস্থায়। সেই স্বর্গসুখও যে বাস্তবে নরকযন্ত্রণায় রূপ নিয়েছে তা পৃথিবীর দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়। এই মুহূর্তে পৃথিবীর ছয় কোটি মানুষ উদ্বাস্তু। খাবারের অভাবে প্রাণের ঝুঁকিতে ধুকছে কোটি কোটি বনি আদম। অথচ পৃথিবীতে সম্পদের অভাব নেই। এই গ্রহেরই এমন রাষ্ট্র আছে যার রাষ্ট্রপ্রধানরা টাকা খরচ করবেন কোথায় তা ভেবে পাচ্ছেন না। শুধু ২০১৬ সালে বিশ্বে সামরিক খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, হিসাব করে দেখা যাচ্ছে এই টাকায় ৩৮৩ বার আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ দূর করা সম্ভব হত। একদিকে মানুষ না খেতে পেয়ে প্রাণ হারাচ্ছে, অন্যদিকে মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে হাজার হাজার কোটি ডলার দিয়ে মানুষকেই মারার অস্ত্রপাতি তৈরি করা হচ্ছে, এই হচ্ছে এই সভ্যতার স্বর্গসুখ, জান্নাত।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতা দিবারাত্রি যেই ধর্মকে অশান্তি (জাহান্নাম) ও নিপীড়নের কল বলে অপপ্রচার চালায় সেই ধর্মের শাসন এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল যে মানুষ দরজা খুলে ঘুমাত, স্বর্ণের দোকান খোলা রেখে মসজিদে নামাজ পড়তে যেত, কেউ অপরাধ করলে নিজেই নিজের বিচার দাবি করত! ইসলামের স্বর্ণযুগে মানুষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ যাকাত দেবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, কিন্তু গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যেত না। শহরে-বন্দরে লোক না পেয়ে অনেকে উটের পিঠে মালামাল চাপিয়ে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াত যাকাত গ্রহণকারীর সন্ধানে। এগুলো ইতিহাস। অর্থাৎ দেখা গেল পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতা যেটাকে বলল স্বর্গ সেটা আসলে নরক, আর যেটাকে বলা হলো নরক, সেটাই যুগ যুগ ধরে মানুষকে স্বর্গসুখ দিয়ে এসেছে, আজও দিতে সক্ষম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে- ঠিক এই কথাটিই আল্লাহর রসুল বলে গেছেন যে, ''দাজ্জাল যেটাকে জান্নাত বলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর সে যেটাকে জাহান্নাম বলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। তোমরা যদি তার (দাজ্জালের) সময় পাও তবে দাজ্জাল যেটাকে জাহান্নাম বলবে তাতে পতিত হয়ো, সেটা তোমাদের জন্য জান্নাত হবে। [আবু হোরায়রা (রা.) এবং আবু হোযায়ফা (রা.) থেকে বোখারী ও মুসলিম]

কিন্তু আজ আমাদের দুর্ভাগ্য যে, মিথ্যাবাদী প্রতারক দাজ্জাল যেটাকে জান্নাত বলেছে সেটাকেই এই জাতি পরম ভক্তির সাথে গ্রহণ করে নিয়েছে। আর তার পরিণতিতে পাশ্চাত্যের এই বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা ইতোমধ্যেই মানবজাতিকে এক ভয়াবহ দুর্যোগের মুখে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তবু দাজ্জালের সৃষ্ট মোহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কেউ যদি দাজ্জালকে দাজ্জাল বলে চিনিয়েও দেয়, এই জাতির ধর্মগুরুরা তাতে বিরক্ত হন, বিক্ষুব্ধ হন, ফুঁসে উঠে তেড়ে আসেন- ''কী! আমরা তার মানে দাজ্জালের অনুসারী! আমরা এই এত এত নামাজ পড়ছি, রোজা রাখছি, হজ্ব করতে যাচ্ছি, মিলাদ করছি, মসজিদ-মাদ্রাসায় দান-খয়রাত করছি! এসব চোখে পড়ছে না তোমার?'' তাদের জন্যই হয়ত আল্লাহর রসুল বলে গেছেন, 'দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে কাফের লেখা থাকবে। কেবল মো'মেনরাই তা দেখতে ও পড়তে পারবে। মো'মেন না হলে পড়তে পারবে না (বোখারী, মুসলিম)।'

এই হাদিসে আল্লাহর রসুল বললেন না দাজ্জালের কপালের কাফের লেখা কেবল নামাজীরাই পড়তে পারবেন, বললেন না হাজীরাই পড়তে পারবেন, এও বললেন না যে শিক্ষিত, ওলামা, মাশায়েখ, মোহাদ্দীস, মোফাসসির, মাওলানা সাহেবরা পড়তে পারবেন। বললেন নির্দিষ্ট করে কেবল মো'মেনদের কথা। কাজেই দাজ্জালকে চিনতে হলে অবশ্যই মো'মেন হতে হবে। যারা মো'মেন তারা ঠিকই এই সভ্যতার মুখোশের অন্তরালের কুৎসিত দানবীয় চেহারাটি চিনে ফেলবেন এবং যথাসাধ্য প্রতিরোধ করবেন। কিন্তু এই যে মানুষগুলো বলছেন যে, এটা দাজ্জাল নয়, দাজ্জাল অন্য কেউ, তাদের প্রতি প্রশ্ন হচ্ছে- এটাকে দাজ্জাল মনে হচ্ছে না বলেই কি আপনি এই প্রতারক সভ্যতাকে প্রতিরোধ করবেন না? এই সভ্যতার বিষাক্ত ছোবল থেকে মানুষকে বাঁচাবেন না? দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে এই সভ্যতা। তাতে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা ইতিহাস হয়ে আছে। এবার যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, যদি এই সভ্যতার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সবচাইতে ভয়াবহ অপব্যবহারটি অর্থাৎ পরমাণু অস্ত্রগুলো একের পর এক আছড়ে পড়তে থাকে আমাদের এই ধরিত্রীর বুকে, তবে পুরো মানবজাতি এখনই বিনাশ হয়ে যাবে। পৃথিবী নামক গ্রহটিই ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি বসে আছেন যে দানবের আশায়, পৃথিবীই যদি না থাকে তাহলে সেই দানব আসবে কোথায়? কাজেই এখনই সময় পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী এই যান্ত্রিক সভ্যতার দাজ্জালীয় তাণ্ডব থেকে নিজেকে, জাতিকে ও ভবিষ্যৎ বংশধরকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবার। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই যাবতীয় অন্যায়, অসত্য ও দাজ্জালীয় তাণ্ডবের বিরুদ্ধে।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ